

■ বোর্ড বইয়ের আলোকে রচিত রচনা

১. বৈচিত্র্যময় বাংলাদেশ

(পিটিআই সংস্করণ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ, নেত্রকোণা; মরমনসিংহ সদর ২০২৬/)

বা আমাদের দেশ

(প্রা.শি.স.প. ১৯, ১৮; ৮৮-নং মানিকগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মানিকগঞ্জ ২০২৬/)

বা আমার জন্মভূমি

সংকেত: সূচনা; অবস্থান ও আয়তন; জনসংখ্যা; স্বাধীনতা; ভাষা; পেশা; উৎসব; পোশাক-পরিচ্ছদ; প্রাকৃতিক সৌন্দর্য; অর্থনৈতিক অবস্থা; উপসংহার।

সূচনা: বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও ধর্ম-বর্ণের মানুষের সমন্বয়ে আমাদের এই বাংলাদেশ। কেবল বিচিত্র মানুষ নয়, বিচিত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমিও এই বাংলাদেশ।

অবস্থান ও আয়তন: বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ। এর তিন দিকে ভারত ও মিয়ানমার এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। বাংলাদেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার।

জনসংখ্যা: বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। দেশের মোট জনসংখ্যা প্রায় ১৭ কোটি। জনসংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীতে এর স্থান অষ্টম।

স্বাধীনতা: ১৯৭১ সালে এ দেশ স্বাধীন হয়। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্বাধীনতা যুদ্ধ চলে। এতে লক্ষ লক্ষ মানুষ শহিদ হন।

ভাষা: এ দেশের অধিকাংশ মানুষের মাতৃভাষা বাংলা। এছাড়াও এ দেশে আরও অনেক আদিবাসী রয়েছে, যারা অঞ্চল ও গোষ্ঠীভেদে নিজস্ব ভাষায় কথা বলে। বাংলা আমাদের রাষ্ট্রভাষা।

পেশা: বাংলাদেশে নানান পেশার মানুষ বাস করে। যার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো— কৃষক, শ্রমিক, জেলে, কুমার, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিক্ষক, আইনজীবী, ব্যবসায়ী ইত্যাদি।

উৎসব: বাংলাদেশে রয়েছে উৎসবের বৈচিত্র্য। মুসলমানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা। হিন্দুদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা, বৌদ্ধদের বুদ্ধপূর্ণিমা আর খ্রিস্টানদের বড়দিন। এগুলোর বাইরেও আরও কিছু উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। যেমন— পহেলা বৈশাখে উদ্‌যাপিত হয় বাংলা নববর্ষ। রাখাইনদের উৎসবের নাম সাংগ্রাই, আর চাকমাদের উৎসব বিজু।

পোশাক-পরিচ্ছদ: বাংলাদেশের মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদে আছে বৈচিত্র্য। পাজামা-পাজাবি, শার্ট-প্যান্ট, শাড়ি-রাউজ, সালোয়ার-কামিজ— আরও কত রকমের পোশাক যে আছে! ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মানুষের পোশাকেও বৈচিত্র্য দেখা যায়। চাকমাদের পোশাকের নাম পিনোন ও হুদি। মারমাদের পোশাকের নাম দেয়াহ। সাঁওতালরা পরে থাকে পাখি নামের একধরনের পোশাক। গারোদের পোশাকের নাম দকমান্দা।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য: আমার দেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক অপূর্ব লীলানিকেতন। এখানে রয়েছে অনেক নদনদী যেমন: পদ্মা, মেঘনা, যমুনা। এসব নদীতে মাঝিরা নৌকা চালায়। জেলেরা মাছ ধরে। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত আমার দেশের ছয়টি ঋতু। গ্রীষ্মে বৃষ্টি হয়ে ওঠে প্রকৃতি। বর্ষা নিয়ে আসে অঝোর বৃষ্টি। নীল আকাশে সাদা মেঘ আর কাশফুল নিয়ে আসে শরৎ। হেমন্তে ঘরে ঘরে নতুন ধান ওঠে। এরপর শীত আসে হিমেল হওয়া নিয়ে। বসন্তের আগমনে গাছে গাছে সবুজ পাতা আর ফুলের সমারোহ সবাইকে মুগ্ধ করে। কক্সবাজারে রয়েছে বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত। সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমাদের মুগ্ধ করে।

অর্থনৈতিক অবস্থা: আমাদের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর। তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশ বিশ্বে দ্বিতীয়। এই খাত থেকেই সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়ে থাকে।

উপসংহার: আমাদের প্রিয় জন্মভূমিকে আমরা মায়ের মতো শ্রদ্ধা করি ও ভালোবাসি। অনেক ত্যাগ আর প্রাণের বিনিময়ে আমরা এ দেশ স্বাধীন করেছি। তাই এ দেশের স্বাধীনতা ও শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য আমরা সদা সচেষ্ট থাকব।

২. বীরপুরুষ শহিদ তিতুমীর

(প্রা.শি.স.প. ০৯, ১২/)

বা শহিদ তিতুমীর

(মরমনসিংহ সদর; ৮৮-নং মানিকগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ২০২৬/)

সংকেত: ভূমিকা; শিক্ষা; সংগ্রামী আন্দোলন; ধর্মসংস্কার আন্দোলন; সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কার; নারকেলবাড়িয়ার 'বাঁশের কেদা'; নারকেলবাড়িয়ার লড়াই; উপসংহার।

ভূমিকা: দেশকে স্বাধীন করার জন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে যে সকল সাহসী মানুষ সংগ্রাম করেছিলেন, শহিদ তিতুমীর তাদের মধ্যে অন্যতম।

তিতুমীরের পরিচয়: তিতুমীর ১৭৮২ সালে চক্ৰিশ পরগনা জেলার হায়দারপুর গ্রামে মীর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম সৈয়দ মীর নিসার আলী।

শিক্ষা: তিতুমীর গ্রামের মাদ্রাসায় কোরআন, হাদিস, আরবি, ফারসি ভাষা ও সাহিত্যে শিক্ষালাভ করেন। পরে কুষ্টি, লাঠিখেলা, তির ছোড়া আর অসি চালনাও দক্ষতা অর্জন করেন তিনি।

সংগ্রামী আন্দোলন: তিতুমীরের লক্ষ্য ছিল জমিদার ও ব্রিটিশ নীলকরদের অত্যাচার থেকে কৃষকসহ দরিদ্র শ্রেণিকে রক্ষা করা। সব সম্প্রদায়ের অত্যাচারিত মানুষ তাঁর আন্দোলনে যোগ দেয়।

ধর্মসংস্কার আন্দোলন: ১৮২২ সালে তিতুমীর হজ করতে মক্কা যান। সেখানে তিনি ভারতের ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের নেতা সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর শিষ্য হন এবং ওহাবি মতবাদ গ্রহণ করেন। হজ থেকে ফিরে তিতুমীর বাংলার মুসলিম সমাজ থেকে কুসংস্কার দূর করার জন্য প্রচার চালাতে থাকেন।

সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কার: তিতুমীর হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কৃষকদের জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে সংগঠিত করেন। তাঁর বাহিনীর সদস্য সংখ্যা একসময় বেশ কয়েক হাজারে ওঠে। তিতুমীর পশ্চিমবঙ্গের চক্ৰিশ পরগনার কিছু অংশ ও নদীয়া এবং ফরিদপুর জেলার একাংশে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

নারকেলবাড়িয়ার 'বাঁশের কেদা': তিতুমীর বারাসাতে বিদ্রোহ করার পর ইংরেজ সরকার তাঁর ব্যাপারে সতর্ক হয়ে ওঠে। এরপর বড়ো লড়াইয়ের প্রকৃতি হিসেবে তিতুমীর নারকেলবাড়িয়ায় একটি সুরক্ষিত বাঁশের কেদা নির্মাণ করেন।

নারকেলবাড়িয়ার লড়াই: ১৮৩০ সালে ইংরেজ সরকার তিতুমীরকে দমন করতে এক অভিযান চালিয়ে ব্যর্থ হয়। ১৮৩১ সালে কর্নেল স্টুয়ার্টের নেতৃত্বে এক বিশাল বাহিনী তিতুমীরের বাঁশের কেদা আক্রমণ করে। ইংরেজ বাহিনীর কামানের গোলায় কেদাটি গুঁড়িয়ে যায়। বীরের মতো যুদ্ধ করে তিতুমীর ও তাঁর ৪০ জন সহচর শহিদ হন।

উপসংহার: সাহসী তিতুমীরের প্রতিরোধ বাঙালি তথা ভারতীয়দের ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামে প্রেরণা জুগিয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামেও তিনি ছিলেন অন্যতম অনুপ্রেরণা।

৩. বাংলাদেশের জাতীয় পশু বাঘ

বা রয়েল বেঙ্গাল টাইগার

(৮৮-নং মানিকগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পেরপুর সদর ২০২৬/)

সংকেত: ভূমিকা; দৈহিক গড়ন ও বৈশিষ্ট্য; খাদ্যাভ্যাস; বাসস্থান; বাঘ সংরক্ষণ ও গবেষণা; উপসংহার।

ভূমিকা: রয়েল বেঙ্গাল টাইগার বাংলাদেশের জাতীয় পশু। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বিশাল এলাকাজুড়ে বিরাজমান সুন্দরবন এর একমাত্র আবাসস্থল। রয়েল বেঙ্গাল টাইগার বাংলাদেশকে এনে দিয়েছে ব্যাপক আন্তর্জাতিক পরিচিতি।

দৈনিক গড়ন ও বৈশিষ্ট্য: বাঘ হচ্ছে এক প্রজাতির বৃহৎ বন্য বিড়াল। এর দেহবর্ণ গাঢ়-হলুদ থেকে লালচে হলুদ, তার মধ্যে লম্বা কালো ভোরাকাটা দাগ। পেটের দিকের রং অনেকটা সাদাটে। নখ খাবার ভেতরে লুকানো থাকে। মাথাসহ রয়েল বেজাল টাইগারের দৈর্ঘ্য ২২০ সে.মি; গড় উচ্চতা ১০০ সে.মি। পূর্ণবয়স্ক পুরুষ বাঘের ওজন ২২০ কেজি এবং বাঘিনির ওজন ১৪০ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। বাঘিনি একসাথে তিন থেকে চারটি পর্যন্ত বাচ্চা হয়।

খাদ্যাভ্যাস: প্রধানত রয়েল বেজাল টাইগার আহার হিসেবে মাঝারি ও বড়ো আকারের স্তন্যপায়ী হরিণ, বুনা শূকর ইত্যাদি শিকার করে থাকে। একটি বড়ো আকারের রয়েল বেজাল টাইগারের দৈনিক গড় মাংসের চাহিদা ৭-৮ কেজি।

বাসস্থান: একসময় বাংলাদেশের প্রায় সব বনাঞ্চলেই রয়েল বেজাল টাইগার বাস করত। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশের শুধু সুন্দরবন অঞ্চলেই অল্প কিছু রয়েল বেজাল টাইগারের বসবাস রয়েছে। বাংলাদেশ ছাড়াও রয়েল বেজাল টাইগার ভারত, নেপাল, চীন ও পশ্চিম মিয়ানমারের কিছু বনাঞ্চলে বসবাস করে।

বাঘ সংরক্ষণ ও গবেষণা: বাংলাদেশের জাতীয় পশু রয়েল বেজাল টাইগার বর্তমানে একটি লুপ্তপ্রায় বন্য প্রাণী। বাঘের পায়ের ছাপ পর্যবেক্ষণ করে 'পাণ্ডামার্ক' পদ্ধতিতে গণনা করা হয়ে থাকে। সর্বশেষ ২০২৪ সালের জরিপ অনুযায়ী সুন্দরবনে বাঘের প্রকৃত সংখ্যা ১২৫টি।

উপসংহার: সুন্দরবন এলাকায় এখন বাঘের খাদ্য সংকট প্রকট। বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় পশু রয়েল বেজাল টাইগারের সংরক্ষণের জন্য অভয়ারণ্য গড়ে তোলা দরকার। তা না হলে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের এ জাতীয় পশু হয়তো শুধু চিড়িয়াখানাতেই শোভা পাবে।

৪. বাংলাদেশের কুটির শিল্প

সংকেত: ভূমিকা; কুটির শিল্প; কুটির শিল্পের ধরন ও নাম; কুটির শিল্পের অতীত অবস্থা; কুটির শিল্পের প্রয়োজনীয়তা; কুটির শিল্প পুনরুদ্ধারের উপায় ও উদ্যোগ; উপসংহার।

ভূমিকা: কুটির শিল্প বাংলার হারিয়ে যাওয়া গৌরব ও ঐতিহ্যের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। শিল্পায়নের উন্নতির আগে কুটির শিল্প বাংলার অর্থনীতি ও সামাজিক জীবনের চাহিদা পূরণ করত। বিশ্বজোড়া স্বনামধন্য ছিল ঢাকাই-মসলিন, নকশিকাঁথা ও মৃৎশিল্প। কালের স্রোতে আমাদের অতীত ঐতিহ্য আজ বিলীন।

কুটির শিল্প: পরিবারভিত্তিক বা পরিবারের ক্ষুদ্র পরিসরে স্বল্প মূলধন ও সম্পূর্ণ হাতের কাজ দিয়ে চালিত শিল্পই হচ্ছে কুটির শিল্প। কুটিরের মধ্যেই এ শিল্প উৎপাদিত হতো বলে এর নাম কুটির শিল্প।

কুটির শিল্পের ধরন ও নাম: বিসিকের নিজস্ব পরিসংখ্যান অনুযায়ী ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প রয়েছে এক লাখ। দেশের উল্লেখযোগ্য কুটির শিল্পগুলো হলো— তাঁতবস্ত্র, কাঠ শিল্পজাত দ্রব্য, বাঁশ ও বেতের কাজ, বোতাম, টুপি, মাটির পুতুল, বাসনকোসন, চিত্রনি, পাখা, দা, পিতল-কাসার জিনিস, বিনুকশিল্প ইত্যাদি। আরও আছে শীতলপাটি, নকশিকাঁথা, চাদর, শিকা, ফুলদানি ইত্যাদি।

কুটির শিল্পের অতীত অবস্থা: বাংলার কুটির শিল্প একসময় সারা পৃথিবীতে সমাদৃত ছিল। এ দেশে নানা ধরনের কুটির শিল্পজাত দ্রব্য তৈরি হতো। তাঁতিরা বুনত চাদর, গামছা, কাপড়, কুমাররা মাটির হাড়ি-পাতিল, কলস তৈরি করত, কাসারিরা গড়ত কাসার ঘাস-থাল্লা। শীখারিরা বানাত শাঁখের দ্রব্য। দেশে এবং দেশের বাইরে এগুলো বিক্রি হতো চড়া দামে। বাংলার ঢাকাই মসলিন দেশ-বিদেশের রাজদরবারে সমাদৃত ছিল।

কুটির শিল্পের প্রয়োজনীয়তা: বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে কুটির শিল্পের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। হস্তশিল্পজাত দ্রব্যই পারে বিদেশি পণ্যের আমদানি কমিয়ে দেশে স্বনির্ভরতা ফিরিয়ে আনতে। এ শিল্পের প্রচলন আবার শুরুর দিকে দেশে বেকারত্ব কমবে এবং নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। জাপানের শ্রমশক্তির ৩০ ভাগ এই শিল্পে নিয়োজিত এবং ৬০ ভাগ রপ্তানি আয়ের উৎস এই কুটির শিল্প।

কুটির শিল্প পুনরুদ্ধারের উপায় ও উদ্যোগ: দেশের বর্তমান অর্থনীতিতে পুনরায় কুটির শিল্পকে ফিরিয়ে আনতে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। কুটির শিল্পের বাজার তৈরি করতে সঠিক ব্যবস্থাপনা ও জনগণকে এ পণ্য ব্যবহারে উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে কুটির শিল্পকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে।

উপসংহার: বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে কুটির শিল্প এক গৌরব ও সমৃদ্ধির নাম। কিন্তু বিভিন্ন প্রতিকূলতায় আজ এই শিল্প বিপন্নপ্রায়। দেশের বেকারত্ব দূরীকরণ ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে এ শিল্প এক যুগান্তকারী ভূমিকা রাখতে পারে। সরকারি ও বেসরকারি যৌথ পদক্ষেপের মাধ্যমে কুটির শিল্পের সোনালি দিন ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

৫. আমার জীবনের লক্ষ্য

৮/ আমি যা হতে চাই

সংকেত: ভূমিকা; আমার লক্ষ্য; লক্ষ্য নির্ধারণের কারণ; লক্ষ্য অর্জনের উপায়; উপসংহার।

ভূমিকা: প্রত্যেক মানুষের জীবনের একটি লক্ষ্য থাকে। কেউ ডাক্তার হতে চায়, কেউ-বা ইঞ্জিনিয়ার। আমার বাবাকে দেখে আমার ডাক্তার হতে ইচ্ছা করে। কারণ তিনি খুব নিষ্ঠার সাথে মানুষের সেবা করেন।

আমার লক্ষ্য: আমার জীবনের লক্ষ্য হিসেবে আমি ডাক্তারি পেশাকে বেছে নিয়েছি। যাতে অসহায় ও দরিদ্র মানুষের সেবা করতে পারি। আমি দেশের একজন আদর্শ ডাক্তার হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করতে চাই।

লক্ষ্য নির্ধারণের কারণ: আমার দাদাবাড়ি সোনাবাড়ি গ্রামে। বাবা সপ্তাহে দুইদিন সোনাবাড়ি যান। সেখানকার মানুষদের বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা দেন। বাবা আমাকে শুধু নিজের কথা না ভেবে সবার কথা ভাবতে শিখিয়েছেন। তাই আমি ডাক্তার হয়ে সোনাবাড়ি গ্রামের মানুষসহ এমন আরও দরিদ্র গ্রামবাসীর সেবা করব।

লক্ষ্য অর্জনের উপায়: আমার ডাক্তার হয়ে মানবসেবা করার প্রথম ধাপ হলো— আমাকে ডাক্তারি পড়তে হবে। ডাক্তার হতে হলে পড়াশোনার প্রতি আরও মনোযোগী হতে হবে। সে লক্ষ্যে আমি ঠিক করেছি বিজ্ঞান বিভাগে পড়ালেখা করব।

উপসংহার: ডাক্তারি একটি মহান পেশা। তবে এটা শুধু পেশা নয়, সেবাও। আমি বড়ো হয়ে এই জন্যই ডাক্তার হতে চাই, যাতে মানুষের সেবা করতে পারি।

৬. শহিদ বুদ্ধিজীবী

৮/ স্মরণীয় যারা বরণীয় যারা

৮/ শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস

সংকেত: ভূমিকা; শহিদ বুদ্ধিজীবী কারা; বুদ্ধিজীবীদের অবদান; বুদ্ধিজীবী হত্যা; শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস; উপসংহার।

ভূমিকা: ১৯৭১ সালে নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের পাশাপাশি এ দেশের অনেক প্রতিভাশালী বুদ্ধিজীবী ও পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে শহিদ হন। তাঁরাই আমাদের শহিদ বুদ্ধিজীবী। তাঁরা বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান।

শহিদ বুদ্ধিজীবী কারা: সাধারণত দৈনিক শ্রমের পরিবর্তে মানসিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রম দিয়ে যারা সমাজে অবদান রাখেন, তাঁরাই বুদ্ধিজীবী। মুক্তিযুদ্ধের সময় এ রকম অনেক কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, ডাক্তার, সমাজসেবক বুদ্ধিজীবীকে পাকিস্তানি সেনারা হত্যা করে। এসব গুণীজ্ঞানী ব্যক্তিবর্গকে শহিদ বুদ্ধিজীবী বলা হয়। উল্লেখযোগ্য শহিদ বুদ্ধিজীবীর মধ্যে আছেন ড. গোবিন্দচন্দ্র দেব, মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, আনোয়ার পাশা, জ্যোতির্ময় গৃহীকুরতা, শহীদুল্লা কায়সার প্রমুখ।

বুদ্ধিজীবীদের অবদান: বুদ্ধিজীবীগণ প্রত্যেকেই ছিলেন যার যার পেশা ও কর্মক্ষেত্রে খুবই দক্ষ। তাঁদের কর্মদক্ষতা ও দীর্ঘ পেশার প্রতি নিষ্ঠা সাধারণ মানুষের কাছে ছিল অনুকরণীয়। দেশপ্রেমের চেতনায় তাঁরা দেশের আপামর জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। মুক্তিকামী মানুষকে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছেন তাঁরা।

১১৪ পাঞ্জেরী প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা সহায়িকা। পরীক্ষা ২০২৬

বুদ্ধিজীবী হত্যা: ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঘুমন্ত বাঙালিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ভয়ংকর গণহত্যা শুরু করে। সেদিন থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত অনেক বুদ্ধিজীবী তাদের হাতে শহিদ হন। তবে ১৪ ডিসেম্বর তারা সবচেয়ে বেশি পরিমাণে বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করে। মূলত নিশ্চিত পরাজয় জেনে তারা এ জাতিকে মেধাশূন্য করতে এসব বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করে, যাতে এদেশ স্বাধীন হলেও বিশ্বের বুকে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে।

শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস: দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এদেশের কৃতি সন্তান শহিদ বুদ্ধিজীবীগণের আত্মত্যাগের স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রতিবছর ১৪ ডিসেম্বর আমরা রাষ্ট্রীয়ভাবে তাঁদেরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। পত্র-পত্রিকা ও গণমাধ্যমে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশের পাশাপাশি তাঁদের স্মরণে নানা আনুষ্ঠানিকতার আয়োজন লক্ষ করা যায়।

উপসংহার: শহিদ বুদ্ধিজীবীগণ এ জাতির এক এক জন সূর্যসন্তান। তাঁরা দেশমাতৃকার জন্য জীবন দিয়েছেন; কিন্তু পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সাথে কোনো আপস করেননি। তাঁরা জীবন দিয়ে আমাদেরকে দেশপ্রেমের দীক্ষা দিয়ে গেছেন। তাঁদের অসামান্য অবদানের কথা আমরা কখনো ভুলব না। তাঁরা আমাদের কাছে স্মরণীয় এবং বরণীয়।

৭. মাটির নিচে পুরানো নগর

৮/ উয়ারী-বটেশ্বর

সংকলিত: ভূমিকা; অবস্থান ও ইতিহাস; উয়ারী-বটেশ্বরের আবিষ্কারের কথা; প্রাপ্ত নিদর্শনসমূহ; উপসংহার।

ভূমিকা: আজকের বাংলাদেশের রয়েছে এক সমৃদ্ধ অতীত। এদেশের নানা স্থানে থাকা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো সেই সমৃদ্ধ অতীতের পরিচয় বদন করে। এগুলোর মধ্যে উয়ারী-বটেশ্বর বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

অবস্থান ও ইতিহাস: উয়ারী-বটেশ্বর রাজধানী ঢাকা থেকে ৭০ কিলোমিটার দূরে নরসিংদী জেলার বেলাবো ও শিবপুর উপজেলায় অবস্থিত। প্রকৃতপক্ষে উয়ারী ও বটেশ্বর পাশাপাশি দুটি গ্রামের নাম। এখানে মাটি খুঁড়ে প্রাচীন একটি নগর-জনপদের স্থান পাওয়া গেছে। মৃত্তিকা বিজ্ঞানীদের মতে, উয়ারী-বটেশ্বর অঞ্চলের মাটি কয়েক হাজার বছরের পুরানো। খ্রিষ্টপূর্ব সাত থেকে ছয় শতকে এখানে সভ্য জনমানুষের বসতি ছিল। এখানে ছিল সুন্দর নগরী। এরপর সম্ভবত বড়ো ধরনের কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে এই এলাকার ভূপ্রকৃতিতে বড়ো ধরনের পরিবর্তন হয়। হাজার বছর ধরে চলা প্রকৃতির অভ্যঙ্গড়ার খেলায় মাটিচাপা পড়ে যায় এই নগর-জনপদ।

উয়ারী-বটেশ্বরের আবিষ্কারের কথা: উয়ারী ও বটেশ্বর গ্রামে প্রায়ই বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান পাওয়া যেত। ১৯৩৩ সালে স্থানীয় স্কুল শিক্ষক মোহাম্মদ হানিফ পাঠান উয়ারী গ্রাম থেকে প্রাপ্ত বেশ কিছু প্রাচীন রৌপ্যমুদ্রা সংগ্রহ করেন। পরে মোহাম্মদ হানিফ পাঠানের ছেলে হাবিবুল্লাহ পাঠান এ প্রত্নস্থান থেকে প্রচুর নিদর্শন সংগ্রহ করে জাদুঘরে জমা দেন। ২০০০ সালে জাহাজীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক সুফি মোস্তাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে এখানে খনন কাজ শুরু হয়।

প্রাপ্ত নিদর্শনসমূহ: উয়ারী-বটেশ্বরে খনন কাজ করে এ পর্যন্ত অনেক ধরনের গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে আড়াই হাজার বছর পুরোনো একটি প্রাচীন দুর্গ-নগরের ধ্বংসাবশেষ। প্রাপ্ত দ্রব্যাদির মধ্যে রয়েছে পোড়ামাটির ফলক, মূল্যবান পাথর, মুদ্রাজড়ার, গহনা, অস্ত্র, পাথরের বাটখারা, কাচের পুঁতি ইত্যাদি। এসব নিদর্শন থেকে বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এককালে এখানে সমৃদ্ধ এক সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল।

উপসংহার: উয়ারী-বটেশ্বর আমাদের দেশের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান। এখান থেকে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলো বাংলায় প্রাচীন জনপদের বয়স সম্পর্কে অমূল্য তথ্য জোগাবে। তাই নিদর্শনগুলো যত্নের সাথে সংরক্ষণ এবং এ নিয়ে বড়ো ধরনের অনুসন্ধান ও গবেষণা প্রয়োজন।

৮. শিক্ষকের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য

৮/ শিক্ষাগুরুর মর্যাদা

সংকলিত: সূচনা; শিক্ষকের প্রতি সদাচরণ; শিক্ষকদের প্রতিদান; উপসংহার।

সূচনা: বিদ্যালয়ে বা বাড়িতে যিনি বা যারা লেখাপড়া করান তাঁরাই হলেন শিক্ষক। আমরা মাতাপিতার পরেই শিক্ষকদের শ্রদ্ধা করি।

শিক্ষকের প্রতি সদাচরণ: শিক্ষকদের সর্বদা শ্রদ্ধা করা উচিত। তাঁদের প্রতি এমন আচরণ করা উচিত নয়, যাতে তাঁরা কষ্ট পান। শিক্ষক সর্বদা আমাদের মজল কামনা করেন। তাঁরা সর্বদা আমাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। শ্রেণিকক্ষে তাঁরা যখন পাঠদান করেন তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করতে হবে। তাঁদের সঙ্গে সর্বদা ভদ্র ও নম্রভাবে কথা বলা উচিত। তাঁরা যখন যে কাজ করতে বলেন তাই করা উচিত।

শিক্ষকদের প্রতিদান: মাতৃশ্রম যেমন পরিশোধ করা যায় না তেমনি শিক্ষকদের ঋণও শোধ করা যায় না। তাই শিক্ষককে সম্মান ও শ্রদ্ধা করা উচিত। তাঁদের আদেশ ও উপদেশ কোনোক্রমেই অবজ্ঞা করা উচিত নয়। সমাজে শিক্ষকের একটা বিশিষ্ট মর্যাদা রয়েছে। ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করতে এবং জাতীয় অগ্রগতিতে অবদান সৃষ্টির ক্ষমতা অর্জন করতে শিক্ষক আমাদের প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করেন। সুতরাং শিক্ষকের অবদানকে হেলা করা উচিত নয়।

উপসংহার: মাতাপিতার পরই যাকে আমাদের শ্রদ্ধা ও সম্মান করা উচিত তিনি হলেন শিক্ষক। শিক্ষক হলেন— মহান শিক্ষাগুরু ও মানুষ গড়ার কারখানার একজন দক্ষ পরিচালক। শিক্ষক আমাদের জ্ঞানচক্ষু খুলে দেন তাই তাঁদের সর্বদা শ্রদ্ধা ও সম্মান করা আমাদের উচিত। সুতরাং শিক্ষকের প্রতি আমাদের কর্তব্য শুধু ব্যক্তিগত নয়, জাতীয়ও।

৯. মহানবি (স)-এর শেষ ভাষণ

৮/ বিদায় হজ্জ (প্র.র.প. ০৩; প্র.দি.স.প. ১২, ১০)

৮/ বিদায় হজ্জের ভাষণ

সংকলিত: ভূমিকা; বিদায় হজ্জ; ভাষণের বিষয়বস্তু; বিদায় হজ্জের গুরুত্ব; উপসংহার।

ভূমিকা: সত্য, ন্যায় ও মানবতার বাণী মহানবি (স) মানুষের কাছে পৌছে দিয়েছিলেন। তিনি সাহাবিদের নিয়ে হজ্জ পালনের সিদ্ধান্ত নিলে হাজার হাজার মানুষ সমবেত হন।

বিদায় হজ্জ: মহানবি হজ্জরত মুহাম্মদ (স) মানবজাতির উদ্দেশে আরাফাত ময়দানে যে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন তা বিদায় হজ্জের ভাষণ নামে পরিচিত।

ভাষণের বিষয়বস্তু: আরাফাতের ময়দানে বিপুল মানুষের উদ্দেশে মহানবি (স) যা যা বলেছিলেন— (১) আজকের এই দিন, এই মাসটিও তোমাদের কাছে পবিত্র। তোমাদের জীবন ও সম্পত্তি তোমাদের কাছে পবিত্র। (২) একদিন তোমরা আল্লাহর কাছে হাজির হবে। আল্লাহ তোমাদের কাছে তার হিসাব চাইবেন। (৩) তোমাদের ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীরাও আল্লাহর বান্দা। তাদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করো না। (৪) কোনো ক্রীতদাস যদি নিজের যোগ্যতায় আমির হয়। তবে তাকে মেনে চলবে। (৫) মনে রেখো, সব মানুষ একে অন্যের ভাই। তোমরা এক ভাই কখনো অন্য ভাইয়ের সম্পত্তি জোর করে দখল করো না। (৬) কখনো অন্যায় ও অবিচার করো না। (৭) যারা এখানে আসেনি, আমার উপদেশ তাদের কাছে পৌছে দিয়ে। (৮) মানুষ নিজের কাজের জন্য নিজেই দায়ী থাকবে। একজনের অপরাধের জন্য অন্যকে দায়ী করা চলবে না। (৯) ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করবে না। নিজের ধর্ম পালন করবে। যারা অন্য ধর্ম পালন করে তাদের উপর তোমার ধর্ম চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করো না। (১০) আল্লাহ ছাড়া কাউকে উপাসনা করো না। অন্যায়ভাবে মানুষকে হত্যা করো না। পরের সম্পদ অপহরণ করো না। (১১) তোমাদের কাছে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি— ক. আল কুরআন এবং খ. রাসুলের জীবনের আদর্শ। এই দুইটি তোমাদের পথ দেখাবে।

বিদায় হজ্জের গুরুত্ব: মুসলিম জাতির সাফল্য ও মুক্তির জন্য বিদায় হজ্জের ভাষণ হলো চূড়ান্ত দিকনির্দেশনা। আল্লাহর আনুগত্য, তার সার্বভৌমত্ব, সামাজিক স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা এবং ইসলামকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল মানবতার পরম ধর্ম ও মুক্তির দিশা হিসেবে।

উপসংহার: বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবি হজ্জরত মুহাম্মদ (স) মানবজাতির জন্য যে দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মহানবির এই দিকনির্দেশনা মেনে চললে মানবজীবনের সফলতা সুনিশ্চিত।

১০. আমরা তোমাদের ভুলব না

সংকেত: ভূমিকা; ইংরেজ শাসনামল; পাকিস্তানি শাসনামল; মুক্তিযুদ্ধ; স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের লড়াই-সংগ্রাম; উপসংহার।

ভূমিকা: ন্যায়ের পথে লড়াই করতে গিয়ে যারা মৃত্যুবরণ করেন তাঁরা শহিদ। ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন এবং তারপরেও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই-সংগ্রাম করতে গিয়ে দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ শহিদ হন। পল্লী ও আহত হন হাজার হাজার মানুষ।

ইংরেজ শাসনামল: ইংরেজদের শোষণ ও নির্যাতন থেকে কৃষকদের মুক্ত করতে যুদ্ধ করেছিলেন তিতুমীর। এজন্য তিনি বাংলার কোন্টা গড়ে তুলেছিলেন। সেই কোন্টায় তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে শহিদ হন। পরবর্তী সময়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করার কারণে সূর্য সেন, প্রীতিলতাশহ আরও অনেকেই প্রাণ হারাতে হয়।

পাকিস্তানি শাসনামল: ১৯৪৭ সালে রাষ্ট্রভাষা নিয়ে আন্দোলন করতে গিয়ে রফিক, শফিউর, সালাম, বরকত ও জব্বারসহ আরও অনেকেই শহিদ হন। তারই ধারাবাহিকতায় উনসত্তরে শহিদ হন আসাদ। একইসাথে শহিদ হন কিশোর মতিয়ুর, সার্জেন্ট জহুরুল হক ও অধ্যাপক শামসুজ্জোহাশহ আরও অনেকেই।

মুক্তিযুদ্ধ: ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী গণহত্যা চালায়। এতে ছাত্র-জনতা ও পুলিশসহ ইপিআরের অনেক সদস্য শহিদ হন। এরই ধারাবাহিকতায় শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। এ যুদ্ধে দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ শহিদ হন।

স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের লড়াই-সংগ্রাম: স্বাধীনতার পরও বাংলাদেশে ক্ষমতাসীনদের অত্যাচার-নিপীড়ন থেমে থাকে না। তাদের দুঃশাসন ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রাম করতে গিয়ে আরও অনেকে শহিদ হন। ১৯৮৩ সালে শিক্ষা-আন্দোলন করতে গিয়ে শহিদ হন ছাত্রনেতা বেলিন ও দেলোয়ার। ১৯৮৭ সালে গণতন্ত্রের মুক্তির জন্য হেরাচারবিরোধী আন্দোলন করতে গিয়ে শহিদ হন নূর হোসেন। ১৯৯০ সালে শহিদ হন জহুরুল মিলন ও জেহাদ। তারপর ২০১৮ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন করতে গিয়ে শহিদ হন আবু সাঈদ, মীর মুশ্ব ও ওয়াসিম আকরামসহ অসংখ্য মানুষ।

উপসংহার: দেশের জন্য যারা আত্মদান করেছেন তাঁরা এ দেশের সূর্যসন্তান। তাঁদের অবদান জাতি কখনো ভুলবে না। আত্মোৎসর্গকারী ত্যাগী শহিদদের জাতি চিরকাল শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে।

■ বোর্ড বই বহির্ভূত রচনা

ঐতিহাসিক ঘটনা

১১. একুশে ফেব্রুয়ারি

রা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস /প্র.পি.স.প. ১৮/

সংকেত: সূচনা; ঐতিহাসিক পটভূমি; শহিদ মিনার; আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস; একুশে ফেব্রুয়ারি ও বাংলা ভাষার ব্যবহার; উপসংহার।

সূচনা: একুশে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের রক্তে রাঙা একটি ঐতিহাসিক দিন। মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য যারা শহিদ হয়েছেন, তাঁদের রক্তে রাঙা এদিন।

ঐতিহাসিক পটভূমি: ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় রমনার রেসকোর্স ময়দানে এক জনসভায় ঘোষণা করেন, 'উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।' এ কথা শুনে বাংলার দামাশ ছেলেরা সঙ্গে সঙ্গে এর তীব্র প্রতিবাদ জানান। এরপর ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীনও এক জনসভায় ঘোষণা দেন— 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।' তার এ বক্তব্যের প্রতিবাদে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ছাত্ররা ১৪৪ দ্বারা ভক্ত করে মিছিল বের করলে পুলিশ তাদের উপর গুলি চালায়। এতে সালাম, বরকত, জব্বার, শফিউর ও রফিকসহ নাম না জানা আরও কয়েকজন শহিদ হন। ফলে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ১৯৫৬ সালে প্রণীত সর্বিধানে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়।

শহিদ মিনার: বর্তমান ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে ভাষা শহিদদের স্মরণে তৈরি করা হয় কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার। এখানেই শহিদ হয়েছিলেন বরকত। এ শহিদ মিনার আজ আমাদের গর্ব আর অহংকারের প্রতীক।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস: ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থা ইউনেস্কোর ৩০তম সাধারণ সম্মেলনে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক 'মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এরপর থেকে ইউনেস্কোর সদস্যভুক্ত দেশগুলো এদিনকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে পালন করে আসছে। যা আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়।

একুশে ফেব্রুয়ারি ও বাংলা ভাষার ব্যবহার: এখনো রাষ্ট্রের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করা সম্ভব হয়নি। যা খুবই দুঃখজনক। যেদিন তা চালু হবে সেদিনই শহিদদের প্রতি আমাদের পরিপূর্ণ সম্মান দেখানো হবে।

উপসংহার: বাংলাই পৃথিবীর একমাত্র ভাষা, যে ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষকে জীবন দিতে হয়েছে। তাই রাষ্ট্রের সর্বস্তরে এ ভাষা চালু হোক এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

১২. মুক্তিযুদ্ধ /প্র.পি.স.প. ১৯/

সংকেত: ভূমিকা; মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি; মুক্তিযুদ্ধ; উপসংহার।

ভূমিকা: পরাধীনতা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এ দেশের স্বাধীনতাকামী মানুষ বারবার অসংখ্য আন্দোলন, সংগ্রাম ও যুদ্ধ করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এ দেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। যে যুদ্ধের মাধ্যমে এ স্বাধীনতা অর্জিত হয় বাংলাদেশের ইতিহাসে সেটাই মুক্তিযুদ্ধ হিসেবে পরিচিত।

মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি: ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুইটি দেশের জন্ম হয়। পাকিস্তানের ছিল দুইটি অংশ— পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান। নামে স্বাধীন হলেও পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীরা সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর হাতে জিম্মি হয়ে পড়ে। এ কারণেই ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়লাভ করলেও তাদের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। এসব নিয়ে উভয়পক্ষের মধ্যে চরম বিরোধ ও উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। তাই শাসকগোষ্ঠী ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে নির্বিচারে গণহত্যা শুরু করে। এই গণহত্যার বিরুদ্ধে দেশের সাধারণ মানুষ ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তাদের পাশাপাশি বিভিন্ন বাহিনীর বাঙালি সদস্যরাও এতে যুক্ত হন। এরই ধারাবাহিকতায় ২৬শে মার্চ ঘোষণা করা হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা।

মুক্তিযুদ্ধ: ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার আত্মকাননে এ সরকার শপথ গ্রহণ করে। এরপর সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী নতুন উদ্যমে সুসংগঠিতভাবে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। এগারোটি সেক্টরে বিভক্ত মুক্তিবাহিনী দীর্ঘ নয় মাস পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর তাদের বিজয় ছিনিয়ে আনে। এরই মধ্য দিয়ে পৃথিবীর মানচিত্রে আরও একটি নতুন স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম হয়, যার নাম বাংলাদেশ।

উপসংহার: মুক্তিযুদ্ধ এ দেশের ইতিহাসে একইসঙ্গে সবচেয়ে বেদনাদায়ক ও গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমেই আমরা স্বাধীন হয়েছি। তাই জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে এর চেতনা সমুদয় রাখা আমাদের পরিচয় দায়িত্ব।

১৩. স্বাধীনতা দিবস /প্র.পি.স.প. ১৮/

সংকেত: ভূমিকা; দিবসটির পটভূমি; মুক্তিযুদ্ধ; স্বাধীনতা দিবস উদযাপন; উপসংহার।

ভূমিকা: পৃথিবীর ছোটো-বড়ো প্রতিটি দেশেই এমন কতকগুলো গৌরবোজ্জ্বল জাতীয় দিবস আছে, যোগুলো প্রতিবছরই অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে উদযাপিত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস তেমনই এক পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ দিন।

দিবসটির পটভূমি: ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অধিকাংশ আসনে জয়লাভ করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু শাসক দল বিষয়টিকে স্বাভাবিকভাবে নিতে পারেনি। ফলে যথাসময়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিবর্তে তারা গণ্ডিমসি শুরু করে। এসব নিয়ে উভয়পক্ষের মধ্যে

১১৬ পাঞ্জেরী প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা সহায়িকা। পরীক্ষা ২০২৬

চরম বিরোধ ও উত্তেজনা তৈরি হয়। তাই শাসকগোষ্ঠী ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে নির্বিচারে গণহত্যা শুরু করে। এই গণহত্যার বিরুদ্ধে দেশের সাধারণ মানুষ ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তাদের পাশাপাশি বিভিন্ন বাহিনীর বাঙালি সদস্যরাও এতে যুক্ত হন। এরই ধারাবাহিকতায় ২৬শে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধ: ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার আত্মকাননে এ সরকার শপথ গ্রহণ করে। এরপর সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী নতুন উদ্যমে সুসংগঠিতভাবে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। এগারোটি সেক্টরে বিভক্ত মুক্তিবাহিনী দীর্ঘ নয় মাস পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর তাদের বিজয় ছিনিয়ে আনে। এরই মধ্য দিয়ে পৃথিবীর মানচিত্রে আরও একটি নতুন স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম হয়, যার নাম বাংলাদেশ।

স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন: ১৯৭২ সালের ২৬শে মার্চ বাংলাদেশে প্রথম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হয় এবং ১৯৮০ সালে তৎকালীন সরকার দিনটিকে জাতীয় দিবস হিসেবে উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। তারপর থেকে প্রতিবছর তোষণধনি, জাতীয় পতাকা উত্তোলন, শহিদদের স্মৃতিসৌধে পুষ্পমাল্য অর্পণ, সামরিক কুচকাওয়াজ ইত্যাদি আয়োজনের মধ্য দিয়ে এ দিবসটি উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। এদিনটি উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন জেলখানা, এতিমখানা, হাসপাতাল ও শিশু সদনে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়। মসজিদ, মন্দিরসহ বিভিন্ন উপাসনালয়ে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়।

উপসংহার: স্বাধীনতা একটি জাতির সবচেয়ে গৌরবের বিষয়। স্বাধীনতার চেতনা আমাদের মনে সঞ্চারিত হওয়ার জন্য যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করাটা আমাদের জন্য একান্ত অপরিহার্য।

১৪. বিজয় দিবস /জি.পি.স.প. ১৮, ১৬/

সংকেত: সূচনা; পটভূমি; মুক্তিযুদ্ধ; বিজয় দিবস; উপসংহার।

সূচনা: বিজয় দিবস আমাদের জাতীয় জীবনের একটি গৌরবময় দিন। পাকিস্তানি হানাদবাহিনীর সাথে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর আমরা চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করেছিলাম। সেই বিজয় অর্জনের দিনটিই আমাদের গৌরবময় বিজয় দিবস।

পটভূমি: দীর্ঘ দুশো বছর ব্রিটিশদের শাসনে নিষ্পেষিত হওয়ার পর ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুইটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হয়। নামে স্বাধীন হলেও পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী হিসেবে আমরা তখন চরম বৈষম্য ও শোষণের শিকার হতে থাকি। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে প্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়লাভ করলেও তাদের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। উপরন্তু ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাত থেকে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে নির্বিচারে গণহত্যা শুরু করে। এই গণহত্যার বিরুদ্ধে দেশের সাধারণ মানুষসহ বিভিন্ন বাহিনীতে থাকা বাঙালি সদস্যরাও ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এরই ধারাবাহিকতায় ২৬শে মার্চ ঘোষণা করা হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা।

মুক্তিযুদ্ধ: স্বাধীনতা ঘোষণার পরবর্তী মাসেই ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়। ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার আত্মকাননে এ সরকার শপথ গ্রহণ করে। এরপর সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী নতুন উদ্যমে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। এগারোটি সেক্টরে বিভক্ত মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে তখন অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিতে থাকে।

বিজয় দিবস: দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করে। আমরা চূড়ান্তভাবে বিজয় লাভ করি। এরপর থেকে প্রতিবছরই ১৬ই ডিসেম্বর যথাযোগ্য মর্যাদা ও আনন্দ-উৎসবের মধ্য দিয়ে সারা বাংলাদেশে বিজয় দিবস উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে।

উপসংহার: বাংলাদেশ একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের এই মহান স্বাধীনতা। তাই শহিদের রক্তে রঞ্জিত এ বিজয় আমাদের কাছে খুবই গৌরব ও সম্মানের।

১৫. জুলাই গণ-অভ্যুত্থান

৮/ জুলাই বিপ্লব

৮/ চব্বিশের ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থান

সংকেত: ভূমিকা; আন্দোলনের সূত্রপাত; আন্দোলনের ক্রমবিকাশ ও গণ-অভ্যুত্থানে রূপলাভ; ফ্যাসিবাদের পতন; উপসংহার।

ভূমিকা: গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের মানুষ সবসময়ই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। ২০২৪ সালের জুলাই মাসে এ দেশের ছাত্র ও সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণে একটি আন্দোলন সংঘটিত হয়। আন্দোলনটি 'জুলাই বিপ্লব' বা 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থান' নামে পরিচিত। আন্দোলনটির সূত্রপাত হয় সরকারি চাকরির কোটাব্যবস্থা সংস্কারের দাবি নিয়ে। তবে তৎকালীন সরকারের দমন-পীড়ন ও হত্যাকাণ্ডের কারণে এটি গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেয়।

আন্দোলনের সূত্রপাত: বৈষম্যমূলক কোটাব্যবস্থার বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীরা একাধিকবার আন্দোলন করে। শিক্ষার্থীদের দীর্ঘ দিনের কোটা সংস্কার আন্দোলনের ফলে হাইকোর্ট কোটা কমিয়ে ২০১৮ সালে রায় দিয়েছিলেন। কিন্তু ২০২৪ সালের ৫ জুন হাইকোর্ট সেই রায় অবৈধ ঘোষণা করেন। এরই প্রতিক্রিয়ায় ২০২৪ সালে শিক্ষার্থীরা পুনরায় আন্দোলন শুরু করে।

আন্দোলনের ক্রমবিকাশ ও গণ-অভ্যুত্থানে রূপলাভ: ২০২৪-এর পহেলা জুলাই থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সময়কদের নেতৃত্বে সারা দেশের সর্বস্তরের শিক্ষার্থীরা সংগঠিত হতে থাকে। এই আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা। শিক্ষার্থীরা ন্যায্য দাবি নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করেছিল। কিন্তু আন্দোলন দমন করতে তৎকালীন সরকার সশস্ত্র বাহিনী এবং দলীয় সংগঠনগুলোকে ব্যবহার করে। তাদের গুলিতে আবু সাঈদ, মীর মুশ্বসহ অনেকেই শহিদ হয়। আহত হয় হাজার হাজার ছাত্র ও সাধারণ জনতা। সরকারের নির্মমতা ও সহিংসতা দেখে সারা দেশের সাধারণ মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে আন্দোলনে যোগদান করে। ফলে ছাত্র আন্দোলন রূপ নেয় গণ-অভ্যুত্থানে।

ফ্যাসিবাদের পতন: ছাত্র হত্যার প্রতিবাদ এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য ৫ আগস্ট 'লংমার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচি ঘোষণা করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। সেদিন রাজধানী ঢাকা প্রতিবাদী জনতার মহাসমুদ্রে পরিণত হয়। ছাত্র-জনতার ঐক্যবন্ধ শক্তির কাছে পরাজিত হয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ক্ষমতা ও দেশ ত্যাগ করতে হয়।

উপসংহার: 'জুলাই বিপ্লব' আজ বাংলাদেশের ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। স্বৈরশাসনের জাতকালে মানুষ যখন নিরুপায় ঠিক সেই সময়ে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে স্বৈরশাসনের এই পতন চিরকাল অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বাংলাদেশের জাতীয় বিষয়

১৬. বাংলাদেশের জাতীয় পাখি: দোয়েল /জি.পি.স.প. ১৭/

সংকেত: সূচনা; আকৃতি; প্রকৃতি; বাসস্থান; বংশবিস্তার; প্রাপ্তিস্থান; উপসংহার।

সূচনা: বাংলাদেশে যেসব পাখি সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় তাদের মধ্যে দোয়েল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দোয়েল আমাদের জাতীয় পাখি। দোয়েলের মিষ্টিমধুর গান বসন্তে প্রকৃতিকে মুগ্ধ করে তোলে।

আকৃতি: দোয়েল একটি ছোট পাখি। এটি আকারে ছয় ইঞ্চি লম্বা হতে পারে। এর দুইটি সরু পা, দুইটি পাখা, দুইটি চোখ এবং সুন্দর ঠোঁট মানুষকে সহজেই আকৃষ্ট করে। পুরুষ দোয়েলের গলা, মাথা, বুক ও পিঠ মিশকালো। তবে লম্বাটে সাদা সাদা দাগ আছে। পক্ষান্তরে স্ত্রী দোয়েলের রং অনেকটা বাদামি ও ধূসর।

প্রকৃতি: দোয়েল খুব সুন্দর ও মিষ্টি পাখি। দোয়েল বাংলাদেশের 'গানের পাখি' নামে সুপরিচিত। শীতের শেষে বসন্তের আগমনে তারা শিশ দিতে থাকে। শীতের সময় দোয়েল পাখিকে বেশি দেখা যায় না। ঘরের পাশে, লেবু বা ডালিম গাছের ডালে বসে দোয়েল মনের সুখে গান করে। অনেক সময় উঠানের পাশে বিজ্ঞে বা শসা গাছের মাচায় দোয়েল লাফিয়ে বেড়ায় আর শিশ দেয়।

বাসস্থান: অগভীর জঙ্গলে দোয়েল একা বা জোড়াসহ থাকে। গভীর জঙ্গলে এদের দেখা যায় না। আবার একেবারে খোলামেলা জায়গায় বাস করে না। দোয়েল আভিনার কাছাকাছি ঝোপঝাড়, গাছের কোটরে, রাসঘরের পাশে বাস করে।

খাদ্য: কীটপতঙ্গই দোয়েলের প্রধান খাবার। ঘাসের উপর ছড়ানো শস্যকণা বা ছোটো পোকামাকড় খেয়ে এরা জীবনধারণ করে।

বংশবিস্তার: বছরের একটি সময় স্ত্রী দোয়েল তিন থেকে পাঁচটি ডিম পাড়ে। ডিমের রং ফিকে লালচে সবুজ এবং এতে লালচে বাদামি ছাপ থাকে। ডিম ফুটে বাচ্চা হয় এবং সেগুলো লালনপালন করে বড়ো করে তোলে।

প্রাপ্তিস্থান: সাধারণত মৌসুমি জলবায়ুর অঞ্চলে দোয়েল পাওয়া যায়। বাংলাদেশের সর্বত্র এ পাখি দেখা যায়।

উপসংহার: দোয়েল আকারে ছোটো হলেও রং ও আকৃতি খুবই আকর্ষণীয়। বাংলাদেশের অসংখ্য পাখির মধ্যে দোয়েল তাই জাতীয় পাখির মর্যাদা পেয়েছে।

১৭. বাংলাদেশের জাতীয় মাছ: ইলিশ /প্র. দি. স. প. ১৯/

সংকেত: ভূমিকা; আবাসস্থল; খাদ্য হিসেবে ইলিশ; অর্থনৈতিক গুরুত্ব; উপসংহার।

ভূমিকা: বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। এ দেশের নদীগুলোতে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। মাছের সহজলভ্যতার জন্য আমাদের 'মাছে-ভাতে বাঙালি' বলা হয়। বিভিন্ন প্রকার মাছের মধ্যে আলাদা বৈশিষ্ট্যের কারণে ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ।

আবাসস্থল: ইলিশ মাছ সাধারণত সমুদ্রের লোনা পানিতে বাস করে। লোনা পানিতে বাস করলেও ডিম পাড়ার সময় এরা নদীতে আসে। আর এ কারণে আমাদের দেশের পদ্মা, মেঘনা, যমুনা সহ বড়ো নদীগুলোতে ইলিশ পাওয়া যায়। নদীর মোহনায় সবচেয়ে বেশি ইলিশ মাছ পাওয়া যায়। বাংলাদেশের চাঁদপুর জেলা ইলিশের জন্য বিখ্যাত।

খাদ্য হিসেবে ইলিশ: ইলিশ খুবই সুস্বাদু একটি মাছ। রান্না করার সময় এর সুবাস চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এর অনন্য স্বাদ ও সুস্বাদের জন্য দেশের বাইরেও এর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। খাদ্য হিসেবে ইলিশ মাছ বাঙালির পছন্দের শীর্ষে এবং এর পুষ্টিগুণও অনেক। ইলিশ আমাদের শরীরের অমিষের চাহিদা পূরণ করে। আর তাই খাদ্য হিসেবে ইলিশের গুরুত্ব অনেক।

অর্থনৈতিক গুরুত্ব: ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ এবং প্রচুর পাওয়া যায় বলে আমাদের দেশে এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনেক। ইলিশের গুরুত্ব বিবেচনা করে সরকার ডিম পাড়ার মৌসুমে ইলিশ ধরা নিষিদ্ধ করেছে। এছাড়া বাচ্চা ইলিশ বা জটকা ধরাও আইনত অপরাধ। জেলেরা ইলিশ মাছ ধরে অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছলতা লাভ করেছে এবং আমাদের খাদ্যের চাহিদা পূরণ করেছে।

উপসংহার: খাদ্যের উৎস, কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিবেচনায় ইলিশ আমাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি সম্পদ। তাই আমাদের সকলের উচিত এ সম্পদকে রক্ষা করা। জটকা মাছ ধরা ও খাওয়া থেকে বিরত থাকলেই এ সম্পদ আরও বৃদ্ধি পাবে এবং এ মাছের চাহিদা পূরণ হবে।

১৮. আমাদের জাতীয় পতাকা

সংকেত: সূচনা; স্বাধীনতার প্রতীক; পতাকার বিশেষত্ব; সম্মান প্রদর্শন; উপসংহার।

সূচনা: জাতীয় পতাকা একটি স্বাধীন জাতির মর্যাদার প্রতীক। প্রতিটি স্বাধীন জাতির একটি জাতীয় পতাকা রয়েছে। জাতীয় পতাকার মর্যাদা ও মূল্য অপরিণীম।

স্বাধীনতার প্রতীক: আমাদের দেশের নাম বাংলাদেশ। এটি একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। বহু সংগ্রাম ও রক্তের বিনিময়ে আমরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা পেয়েছি। বিশ্বের অন্যান্য স্বাধীন জাতির মতো আমাদেরও স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক হিসেবে একটি জাতীয় পতাকা রয়েছে।

পতাকার বিশেষত্ব: আমাদের জাতীয় পতাকায় সবুজ রঙের জমিনের মাঝখানে রয়েছে লাল বৃত্ত। সবুজ রং বাংলাদেশের শ্যামল প্রকৃতিকে বোঝায় এবং লাল বৃত্ত রক্তঝরা মুক্তিযুদ্ধের প্রতীক। আমাদের জাতীয়

পতাকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ১০:৬। অর্থাৎ দৈর্ঘ্য ১০ ফুট হলে প্রস্থ হবে ৬ ফুট। সবুজ রং প্রকৃতি ছাড়াও দেশের তারুণ্য ও সমৃদ্ধির সম্ভাবনাকে বোঝায়। লাল রঙের রক্তের সাগর পাড়ি দিয়ে আমাদের স্বাধীনতার সূর্য উঠেছে। পতাকার মাঝের রক্তিম সূর্য সেটিই তুলে ধরে। এভাবে এ পতাকার মধ্যে আমাদের প্রকৃতি, গৌরবময় ইতিহাস ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে।

সম্মান প্রদর্শন: জাতীয় পতাকার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য। স্কুল, কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উড়িয়ে তাকে অভিবাদন করতে শিক্ষা দেওয়া হয়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করার সময় উঠে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা জানাতে হয়।

উপসংহার: আমাদের জাতীয় পতাকা আমাদের কাছে অতি প্রিয়। জাতীয় পতাকা দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক। বুকের রক্ত দিয়ে হলেও আমরা তার মর্যাদা রক্ষা করব।

১৯. জাতীয় ফল: কাঁঠাল

বাংলাদেশের জাতীয় ফল /প্র. দি. স. প. ১৯/ ১০/

সংকেত: সূচনা; কাঁঠালের আকার-আকৃতি; প্রাপ্তিস্থান ও সময়; পুষ্টিগুণ; অর্থনৈতিক গুরুত্ব; উপসংহার।

সূচনা: ফলের দেশ, ফলের দেশ বাংলাদেশ। এখানে বিভিন্ন ঋতুতে অসংখ্য ফলের সমারোহ দেখা যায়। কাঁঠাল আমাদের জাতীয় ফল। এটি একপ্রকার গ্রীষ্মকালীন ফল। এটি বাংলাদেশের জাতীয় ফল। বাংলাদেশের সর্বত্র কাঁঠাল গাছ দেখা যায়।

কাঁঠালের আকার-আকৃতি: কাঁঠালের সারা গায়ে ছোটো ছোটো কাঁটা থাকে। কাঁঠাল ছোটো-বড়ো নানা আকৃতির হয়। দেখতে কিছুটা গোলাকার, আবার লম্বাটে আকৃতির কাঁঠালও দেখা যায়। উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু কাঁঠাল চাষের জন্য উপযোগী। এঁটেল-দোঁতাঁশ মাটি কাঁঠাল চাষের জন্য ভালো। কাঁঠালের বিটি কোষশূন্য বা কোষ ছাড়া দুইভাবেই রোপণ করা যায়।

প্রাপ্তিস্থান ও সময়: কাঁঠাল বাংলাদেশ, ভারত ও শ্রীলঙ্কার আদিম ফল। বাংলাদেশে ঢাকা; গাজীপুর, সিলেট, রংপুর, বান্দরবান ও চট্টগ্রামে প্রচুর কাঁঠাল পাওয়া যায়। এছাড়া প্রায় সারা দেশেই কম-বেশি কাঁঠাল পাওয়া যায়। কাঁঠাল একটি গ্রীষ্মকালীন ফল। ফাল্গুন মাসে কাঁঠালের গাছে আঙুলের আকৃতির ইঁচড় দেখা দেয় এবং ক্রমে তা বড়ো হয়ে পূর্ণ কাঁঠালে রূপ নেয়। সাধারণত জ্যৈষ্ঠ মাসে কাঁঠাল পাকতে শুরু করে।

পুষ্টিগুণ: কাঁঠাল স্বাদে-গন্ধে একটি অনন্য ফল। কাঁচা কাঁঠালের তরকারি খাওয়া যায়। কাঁঠাল এমন একটি ফল যার বিটিও নানাভাবে খাওয়া যায়। কাঁঠাল খুব পুষ্টিকর ফল। কাঁঠালে প্রচুর পরিমাণে আমিষ, শর্করা ও ভিটামিন থাকায় তা মানবদেহের জন্য বিশেষ উপকারী।

অর্থনৈতিক গুরুত্ব: কাঁঠাল গাছের রয়েছে নানামুখী অর্থকরী সম্ভাবনা। বিশ্বের সবচেয়ে উন্নতমানের ও সেরা কাঁঠাল আমাদের দেশে। কাঁঠাল গাছের বিশেষত্ব হলো এর কোনো অংশই ফেলনা নয় বরং নানাভাবে উপকারী। হলুদ রঙের জন্য কাঁঠাল কাঠ আসবাবপত্র, ঘরের দরজা, জানালা তৈরির জন্য খুব সমাদৃত। এর আসবাবপত্র খুব দামি ও টেকসই। আসবাবপত্র তৈরিকে কেন্দ্র করে বহু মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। গাছের ডালপালা ও পাতা উত্তম জ্বালানি।

উপসংহার: ফল হিসেবে কাঁঠাল অত্যন্ত জনপ্রিয়। কাঁঠাল শরীরে প্রচুর পুষ্টি জোগায়। গুণে-মানে অনন্য কাঁঠাল আমাদের দেশের জাতীয় ফল।

২০. জাতীয় ফুল: শাপলা /প্র. দি. স. প. ১৯/ ১৭, ১৬, ১০/

সংকেত: সূচনা; পরিচিতি; প্রাপ্তিস্থান; প্রকারভেদ; শাপলার গুরুত্ব; উপসংহার।

সূচনা: শাপলার বৈশিষ্ট্য তার স্নিগ্ধ হাস্যময় রূপ। বাংলাদেশের অসংখ্য ফুলের মধ্যে শাপলা সবচেয়ে পরিচিত ফুল। শাপলা আমাদের জাতীয় ফুল।

পরিচিতি: শাপলা একপ্রকার জলজ ফুল। শুকনো মৌসুমে শাপলার কন্দ মাটির নিচে থাকে। বর্ষার জলের স্পর্শ পেয়ে এর অঙ্কুরিত হয়। মূলের ভিতর থেকে সবুজ নলের মতো একটি দণ্ড উঠে এসে জলের উপরে গাঢ় সবুজ বিশাল পাতা ছড়িয়ে দেয়। তারপর ফুলের কুঁড়ি নিয়ে শাপলার ডাঁটা

মাথা তোলে জলের উপরে। আলো-বাতাসের স্পর্শে ফুটে ওঠে ফুল। একটি দণ্ডের উপর ফুটে ওঠা এ ফুলের একস্তরে অনেকগুলো পাপড়ি আছে। কোনো যত্ন নেই, পরিচর্যা নেই, নিজে নিজেই বিকশিত হয়ে শাপলা ফুল প্রকৃতিকে শোভাময় করে তোলে। শাপলার মৃদু গন্ধ আছে।

প্রাপ্তিস্থান: বর্ষাকালে এ দেশের প্রায় সর্বত্রই শাপলা ফুটতে দেখা যায়। এ দেশের খালবিল, ডোবা-নালা ইত্যাদি জলাভূমিতে শাপলা ফোটে।

প্রকারভেদ: শাপলা একটা পদ্মগোত্রীয় ফুল। আমাদের দেশে তিন রকমের শাপলা জন্মে থাকে। যেমন: সাদা, লাল ও নীল। সাদা শাপলাকেই আমাদের জাতীয় ফুল হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

শাপলার গুরুত্ব: গ্রামবাংলার ছেলেমেয়েরা শাপলা ফুল দিয়ে নানাভাবে সাজগোজ ও খেলাধুলা করে। উৎসবের আয়োজনে শাপলা দিয়ে মঞ্চ সাজানো হয়। তরকারি হিসেবে শাপলার কোমল দণ্ড খুবই জনপ্রিয়। এর ভাঁটা বেশ মুখরোচক। তাছাড়া শাপলা ফুলের দানার খই (চ্যাপের খই) গ্রামবাংলার শিশু-কিশোরদের কাছে খুবই প্রিয়। গ্রামবাংলার দরিদ্র অনেক মানুষই শাপলা ফুল বিক্রি করে জীবিকানির্বাহ করে।

উপসংহার: বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অন্তর আয়োজনে শাপলা একটি সুলভ উপাদান। শাপলার নিরাভরণ সহজ সৌন্দর্য দেখে আমাদের চোখ জুড়ায়, প্রাণ জুড়ায়। তাই শাপলা আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতীক।

বাংলাদেশ

২১. বাংলাদেশের কৃষক

বাংলাদেশের চাষি

সংকেত: সূচনা; কৃষকের অতীত ও বর্তমান অবস্থা; কৃষকের দুরবস্থার কারণ; কৃষকের দুর্দশা দূর করার উপায়; উপসংহার।

সূচনা: শিল্পে কিছু উন্নতি হলেও বাংলাদেশ এখনো মূলত কৃষিপ্রধান দেশ। এ দেশের জাতীয় অর্থনীতি অনেকাংশে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। তাই কৃষককে এ দেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড বলা হয়।

কৃষকের অতীত ও বর্তমান অবস্থা: কৃষকরা প্রাচীনকাল থেকেই বাংলার অর্থনীতিতে অবদান রেখে আসছেন। অতীতে অবস্থাপন্ন কৃষকদের ছিল গোলা ভরা ধান আর গোয়াল ভরা গরু। তবে সাধারণ কৃষকদের বেশির ভাগই সাদামাটা জীবনযাপন করতেন। বর্তমানে দেশের অনেক উন্নয়ন হলেও কৃষকদের ভাগ্যের ততটা উন্নতি হয়নি। বহু কৃষক অন্যের জমি ভাণ্ডে চাষ করেন। বেশির ভাগ সময় তারা পণ্যের ন্যায্য দাম পান না। এ কারণে বেশির ভাগ কৃষকের জীবনযাত্রার মান খুব ভালো নয়।

কৃষকের দুরবস্থার কারণ: আমাদের দেশের বেশির ভাগ কৃষক অশিক্ষিত। আধুনিক চাষপদ্ধতি সম্পর্কে তারা তেমন কিছু জানেন না। পুঁজি কম বলে তারা উন্নত যন্ত্রপাতি বা উপকরণও কিনতে পারেন না। অনেক কৃষক প্রয়োজনমতো ঋণ পান না। এসব কারণে ফলন কম হয়। বিপুলসংখ্যক কৃষকের নিজের জমি নেই। তাছাড়া ফড়িয়াদের খপ্পরে পড়ে তারা ফসলের দাম কম পান।

কৃষকের দুর্দশা দূর করার উপায়: কৃষকদের দুরবস্থা লাঘব করতে হলে কৃষিব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়ন প্রয়োজন। কৃষকদের আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করার প্রশিক্ষণ দিতে হবে। সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রকৃত কৃষকদের কাছে ভালো বীজ, সার, কীটনাশক, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি পৌঁছে দিতে হবে। ভূমিহীন কৃষকদের জমি দিতে হবে। কৃষকদের সুদবিহীন বা নামমাত্র সুদে ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে। পণ্যের ন্যায্য দাম পাওয়াও নিশ্চিত করতে হবে।

উপসংহার: কৃষকরা আমাদের দেশের প্রাণ। কবি বলেছেন, 'সব সাধকের বড়ো সাধক আমার দেশের চাষা'। তাই দেশের সার্বিক আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য কৃষকের উন্নতি অতি জরুরি।

২২. কয়েকটি পরিচিত পাখি

বাংলাদেশের পাখি (জা.দ্বি.স. প. ১৮)

সংকেত: সূচনা; বিভিন্ন প্রজাতি; দোয়েল; টিয়া; কোকিল; ময়না; বুলবুলি; শালিক; ঘুঘু; বাবুই ও চড়ুই; চিল, বাজ; পাখি সংরক্ষণে করণীয়; উপসংহার।

সূচনা: বিভিন্ন রং, গড়ন ও আকারের পাখির কলকালিতে বাংলাদেশের প্রকৃতি হয়ে উঠেছে প্রাণবন্ত। বাংলাদেশের সবুজ প্রকৃতি ও জনজীবনের সঙ্গে এসববিচিত্র পাখির নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।

বিভিন্ন প্রজাতি: বাংলাদেশে অসংখ্য প্রজাতির পাখি রয়েছে। বাংলাদেশের খুব পরিচিত কয়েকটি পাখির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিচে দেওয়া হলো—

দোয়েল: বাংলাদেশের জাতীয় পাখি দোয়েল। এরা আকারে ছোটো হলেও এর রং ও আকৃতি খুবই আকর্ষণীয়। এরা শস্যকণা এবং ছোটো পোকামাকড় খেয়ে জীবনধারণ করে।

টিয়া: টিয়া পাখির শরীরের রং সবুজ, ঠোঁট দুইটি টুকটুক লাল। কিচিরমিচির শব্দে আকাশে দল বেঁধে যখন চলে, বেশ ভালো দেখায়। এদের বাসা নারিকেল বা অন্য যেকোনো গাছের কোটরে।

কোকিল: কোকিল দেখতে কাকের মতো কালো তবে আকারে ছোটো। কোকিলের সুকণ্ঠ মানুষকে মোহিত করে। কোকিলকে 'বসন্তের দূত' বলা হয়।

ময়না: ময়না কোকিলের মতো কালো, তবে ঠোঁট হলদে রঙের। ময়না পাখি অতি সহজে পোষ মানে এবং মানুষের কথার অনুবৃত্তি আওয়াজ তুলতে পারে।

বুলবুলি: গানের পাখি বুলবুলির শরীরের রং কালো ও খয়েরিতে মেশানো। গাছের ডালে বসে এরা একটানা গান করে।

শালিক: শালিক আমাদের খুব কাছের পাখি। এরা ছোটো আকৃতির পাখি। এরা ভীষণ চ্যাচামেচি করে।

ঘুঘু: ঘুঘু পাখি সহজে পোষ মানে। এরা দেখতে যেমন সুন্দর তেমনই এদের কণ্ঠও আকর্ষণীয়। আকারে এরা মাঝারি ধরনের হয়।

বাবুই ও চড়ুই: বাবুইকে শিল্পী পাখি বলা হয়। তাল, খেজুর, বাবলা ও হিজল গাছে এরা ঝুলন্ত বাসা বেঁধে দক্ষ কারিগরের পরিচয় দেয়। চড়ুই ঘরের চালে, ছাদের কানিশে বাসা বাঁধে।

চিল, বাজ: এই পাখি দুইটি সাহসী ও হিংস্র। এরা মাংসভোজী পাখি। এরা সাধারণত মাছ শিকার করে খায়।

পাখি সংরক্ষণে করণীয়: পাখি ফসলের ক্ষতিকর পোকামাকড় খেয়ে আমাদের উপকার করে। পাখি পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে সহায়তা করে। তাই পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাকারী পাখি আমাদের সংরক্ষণ করতে হবে। পাখির উপকারিতা সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করতে হবে।

উপসংহার: পাখি নানাভাবে আমাদের জীবনের সঙ্গে মিশে আছে। এরা নানাভাবে আমাদের উপকার করে। এরা প্রাকৃতিক সম্পদ। তাই এদের সংরক্ষণে আমাদের এগিয়ে আসা উচিত।

২৩. বাংলাদেশের ফল

সংকেত: সূচনা; গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালের ফল; শরৎ ও হেমন্তকালের ফল; শীত ও বসন্তকালের ফল; উপকারিতা; উপসংহার।

সূচনা: প্রকৃতি তার অফুরন্ত দানে এ দেশকে ফুলে-ফলে ভরে রেখেছে। তাই ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে আমরা বাংলাদেশে দেখতে পাই ভিন্ন ভিন্ন ফলের সমারোহ।

গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালের ফল: বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ এই দু'মাস গ্রীষ্মকাল। গ্রীষ্মের পরমে থাকে রসালো ফলের প্রাচুর্য। আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, বেল ইত্যাদি গ্রীষ্মকালীন ফল। আম অত্যন্ত সুস্বাদু। অনেকে বলেন এটি 'ফলের রাজা'। অন্যদিকে কাঁঠাল আমাদের জাতীয় ফল। আষাঢ়-শ্রাবণ দু'মাস বর্ষাকাল। বর্ষায় জনজীবনে দুর্ভোগ নেমে এলেও এ ঋতু আমাদের বিভিন্ন ফল উপহার দেয়। পেয়ারা, আনারস, আমড়া, লেবু ইত্যাদি বর্ষাকালীন ফল।

শরৎ ও হেমন্তকালের ফল: ভাদ্র-আশ্বিন দুই মাস শরৎকাল। বর্ষা শেষে শান্ত, মিশ্র পরিবেশ নিয়ে শরৎ আবির্ভূত হয়। এ সময় তাল, আতা, চালতা, বাতাবি লেবু ইত্যাদি নানা ধরনের ফল পাওয়া যায়। কার্তিক-অগ্রহায়ণ এ দুই মাস হেমন্তকাল। হেমন্তে গ্রামবাংলায় নতুন ধান দিয়ে নবায় উৎসব হয়। তাল, নারিকেল, জলপাই, কামরাড়া, ডালিম ইত্যাদি ফল সে উৎসবকে আরও উপভোগ্য করে তোলে।

শীত ও বসন্তকালের ফল: পৌষ-মাঘ দুই মাস শীতকাল। এ সময় বরই, কমলা, কলা ইত্যাদি ফল পাওয়া যায়। বিদেশ থেকে আসে কমলা ও আঙ্গুরসহ অনেক ধরনের ফল। ফাল্গুন-চৈত্র দুই মাস বসন্তকাল। এ সময় খুব বেশি ফল পাওয়া যায় না। এ সময়কার ফলের মধ্যে তরমুজ, ফুটি, বেল প্রধান। উপকারিতা: ফলের উপকারিতা অনেক। বিভিন্ন ফলে বিভিন্ন রকম খাদ্যপ্রাণ বিনামূল্যে। শরীরের বৃদ্ধি ও রোগ প্রতিরোধের জন্য এটি বিশেষ সহায়ক। উপসংহার: বাংলাদেশ হৃৎকৃত দেশ বলে এখানে বারো মাসই কোনো না কোনো ফল পাওয়া যায়। ফল উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের শীর্ষ দেশগুলোর অন্যতম।

২৪. বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্য

বা বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য (প্র.পি.স.প. ০৮)

সংক্ষেপ: ভূমিকা: বাংলাদেশের বৃহৎ বৈচিত্র্য; গ্রামবাংলা; ঋতু বৈচিত্র্য; উপসংহার।

ভূমিকা: সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা সোনার দেশ হলো আমাদের এই বাংলাদেশ। প্রকৃতি উদার হাতে অপূরণ্য সৌন্দর্য আর মাধুর্য দিয়ে সাজিয়েছে এ দেশকে।

বাংলাদেশের বৃহৎ বৈচিত্র্য: বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে রয়েছে বিশ্বখ্যাত সুন্দরবন। সুন্দরী গাছ আর রয়েল বেঙ্গল টাইগারের জন্য সুন্দরবন বিখ্যাত। এটি বিশ্বের সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বন।

দক্ষিণ-পূর্বের কক্সবাজার সমুদ্র উপকূল বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র-সৈকত। কক্সবাজারে সাগর আর পাহাড়ের মিতালি মুগ্ধ করে দেশবিদেশের পর্যটকদের।

পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং সিলেটে রয়েছে সবুজ মোড়া পাহাড়, ঝরনা, ঢেউ খেলানো চা বাগান আর গাছিন বনের সৌন্দর্য।

পদ্মা, মেঘনা, যনুনা ইত্যাদি বড়ো বড়ো নদী এ দেশের সৌন্দর্যকে অনন্য করে তুলেছে। বড়ো বড়ো বিল, হাওড়গুলোর রূপও নয়নাভিরাম।

গ্রামবাংলা: বাংলাদেশ গ্রামপ্রধান দেশ। দেশের বড়ো অংশ জুড়েই রয়েছে গ্রামের নিটোল সৌন্দর্য। শহরের গতি পেলেই যতদূর দৃষ্টি যায় সবুজ মাঠ। গাছপালায় ঘেরা ছোটো ছোটো বাড়িগুলো ছায়ায়, শান্ত।

ঋতু বৈচিত্র্য: বাংলাদেশ হৃৎকৃত দেশ। ঋতুর প্রকৃতির রয়েছে একধরনের বৃক্ষ সৌন্দর্য। গরমের দাবদাহের পর বর্ষার অঝোর বৃষ্টিতে প্রকৃতি সজীব হয়ে ওঠে। শিউলি ও কাশফুলের শুভ হাসি নিয়ে আসে শরৎ। এরপর হেমন্তে মাঠে মাঠে থাকে পাকা ধানের সোনালি আভা। হেমন্তের পরে শীত আসে হিমেল ছাওয়া নিয়ে। কৃষাণের চাদরে ঢাকা পড়ে রাত আর ভোরের প্রকৃতি। বসন্তে প্রকৃতিতে আবার জাগে চাক্ষুষ। গাছে গাছে সবুজ কচি পাতা আর ফুলের শোভা। এভাবে ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে পৃথক রূপ সাজে বাংলার প্রকৃতি।

উপসংহার: বাংলাদেশের প্রকৃতির রূপের শেষ নেই। বিচিত্র তার সৌন্দর্য। এ অপূরণ্য সৌন্দর্য এ দেশের মানুষের মনকে করেছে সৌন্দর্যের পূজারি, জবুজ আর দেশপ্রণে উদ্বুদ্ধ।

২৫. বাংলাদেশের সুন্দরবন

বা সুন্দরবন (প্র.পি.স.প. ১৮)

সংক্ষেপ: ভূমিকা: সুন্দরবনের আয়তন ও অবস্থান; সুন্দরবনের উদ্ভিদ; সুন্দরবনের প্রাণী; সুন্দরবনের গুরুত্ব; উপসংহার।

ভূমিকা: সুন্দরবন পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো ম্যানগ্রোভ বন। 'সুন্দরী' নামের একধরনের গাছের প্রাধান্য থাকায় এ বনের নাম হয়েছে সুন্দরবন। এটি প্রকৃতিপ্রেমীদের কাছে একটি আকর্ষণীয় স্থান।

সুন্দরবনের আয়তন ও অবস্থান: সুন্দরবনের মোট আয়তন প্রায় ১০,০০০ বর্গকিলোমিটার, যার মধ্যে বাংলাদেশের অংশ ৬,০১৭ বর্গকিলোমিটার। বাকি অংশ ভারতে অবস্থিত। বাংলাদেশের অংশ বৃহত্তর খুলনা জেলায় এবং ভারতের অংশ পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলায় অবস্থিত।

সুন্দরবনের উদ্ভিদ: এ বনে রয়েছে বিচিত্র গাছপালা ও উদ্ভিদের সমাবেশ। এখানে রয়েছে বৃক্ষ, লতাগুল, ঘাস, পরগাছাসহ ৩৩৪ প্রজাতির উদ্ভিদ। সুন্দরবনের সুন্দরী, গেওয়া, গরান, কেওড়া, বাইন, পশুর, কাঁকড়া, ধুন্দুল, গুড়া ইত্যাদি বৃক্ষ খুব মূল্যবান। এছাড়া এ বনের সবখানেই গোলপাতা জন্মে।

সুন্দরবনের প্রাণী: সুন্দরবনে বিচিত্র সব প্রাণী ও পাখি বাস করে। এ বনে প্রায় ৫০ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, ৫০ প্রজাতির সরীসৃপ, ৮ প্রজাতির উভচর এবং ৩২০ প্রজাতির পাখি রয়েছে। স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে রয়েল বেঙ্গল টাইগার পৃথিবী বিখ্যাত। এছাড়াও রয়েছে বানর, শিয়াল, চিত্রা ও মায়া হরিণ, বনবিড়াল, শজারু ইত্যাদি। পাখির মধ্যে বক, সারস, হাড়গিলা, কাদাখোঁচা, গাংচিল, জলকবুতর আরও নানা প্রজাতির পাখি নদীনালা ও গাছপালায় বাস করে। সরীসৃপের মধ্যে রয়েছে কুমির, সাপ, টিকটিকি ইত্যাদি। সুন্দরবনের পানিতে প্রায় ২২২ প্রজাতির মাছ রয়েছে।

সুন্দরবনের গুরুত্ব: এই বিশাল বনভূমি সমুদ্র উপকূলবর্তী সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করে। এছাড়া এর অর্থনৈতিক গুরুত্বও অনেক। স্থানীয় লোকজন বন থেকে পাতা, মধু, কাঠ, ফল, গাছের বাকল ইত্যাদি সংগ্রহ করে বাণিজ্যিকভাবে সরবরাহ করে। সুন্দরবনের কাঠ জালানি, কাঠকয়লা হিসেবে এবং কাগজ তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। সুন্দরবনের সুস্বাদু মধু এবং মাছ বিক্রি করে বহু মানুষ জীবিকানির্ভর করে। উপসংহার: বাংলাদেশ তথা দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নে সুন্দরবনের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। তাই সুন্দরবন ও এর প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় সবাইকে সচেতন হতে হবে।

২৬. বাংলাদেশের প্রাণিজগৎ (প্র.পি.স.প. ১১)

সংক্ষেপ: ভূমিকা: বাংলাদেশের প্রাণী প্রজাতি; বাংলাদেশের প্রাণিজগতের ধরন; বন্যপ্রাণী; গৃহপালিত প্রাণী; উপকারিতা; উপসংহার।

ভূমিকা: পৃথিবীর সব জায়গায় ছড়িয়ে আছে অসংখ্য জাতের প্রাণী। বাংলাদেশেও অনেক ধরনের প্রাণী বাস করে।

বাংলাদেশের প্রাণী প্রজাতি: বাংলাদেশে বনভূমি, নদী, খালবিল ও সাগরে বাস করে অনেক রকমের পশুপাখি এবং জলজ প্রাণী। এছাড়া মানুষের গৃহে বা তার আশেপাশেও নানা প্রজাতির প্রাণী বাস করে।

বাংলাদেশের প্রাণিজগতের ধরন: বাংলাদেশের প্রাণিজগৎ মূলত দুই ধরনের। বন্যপ্রাণী ও গৃহপালিত প্রাণী। এই দুই ধরনের প্রাণীর মধ্যেই রয়েছে কিছু পশু এবং কিছু পাখি।

বন্যপ্রাণী: বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল বাংলাদেশের সুন্দরবন। এ বনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রাণী আমাদের জাতীয় পশু বাঘ। রাজসিক সৌন্দর্যের কারণে একে ডাকা হয় রয়েল বেঙ্গল টাইগার বলে। এ ছাড়া সুন্দরবনে হরিণ, বানর, শূকর, সাপ এবং বক, মাছসহ বহু পাখি পাওয়া যায়। পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেটে রয়েছে পাহাড়ি বনাঞ্চল। সেখানে হাতি, বানর, হরিণ, সাপ, উল্লুক ও অনেক প্রজাতির পাখি দেখা যায়।

গৃহপালিত প্রাণী: গরু, ছাগল, ভেড়া, মছি, কুকুর, বিড়াল, ঘোড়া ইত্যাদি গৃহপালিত পশু। আর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গৃহপালিত পাখি হলো হাঁস, মুরগি, তিতির, কবুতর ইত্যাদি।

এছাড়া বাংলাদেশে কিছু জলজ প্রাণী বাস করে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে কুমির, সাপ, ঘড়িয়ার, গুইসাপ, শূশুক, কচ্ছপ, বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ইত্যাদি।

উপকারিতা: পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় প্রাণীরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গৃহপালিত প্রাণীর ডিম, দুধ, মাংস আমাদের শরীরে পুষ্টি জোগায়। আবার পর্যটনশিল্প এগিয়ে নিতে বন্যপ্রাণীর বড়ো ভূমিকা রয়েছে।

উপসংহার: বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে প্রাণিসম্পদ। বর্তমানে বন, পাহাড় ধ্বংস এবং নদীনালা ড্রাট ও দূষিত হওয়ায় অনেক প্রাণী হারিয়ে যাচ্ছে। প্রাণিজগৎকে রক্ষা করতে আমাদের সকলের এগিয়ে আসা উচিত।

ঋতু বৈচিত্র্য

২৭. বাংলাদেশের ষড়ঋতু

(পিটিআই সংসদ পরীক্ষণ বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ ২০২৬)

বা বাংলাদেশের ঋতু বৈচিত্র্য

সংকেত: সূচনা; ঋতুর ভাগ; গ্রীষ্মকাল; বর্ষাকাল; শরৎকাল; হেমন্তকাল; শীতকাল; বসন্তকাল; উপসংহার।

সূচনা: ঋতু বৈচিত্র্যের দেশ বাংলাদেশ। এ দেশের যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তার পিছনে ছয় ঋতুর প্রভাব খুব বেশি। এই দেশের প্রকৃতি যেমন অপূর্ণ সুন্দর তেমনই এ দেশের ষড়ঋতুও বৈচিত্র্যময়। ঋতুর এই বৈচিত্র্য আছে বলেই আমাদের দেশ এত সুন্দর।

ঋতুর ভাগ: বাংলাদেশে ছয়টি ঋতু— গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত। বিভিন্ন ঋতুতে বাংলাদেশের প্রকৃতির রূপ ও রং বদলে যায়।

গ্রীষ্মকাল: বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ এই দুই মাস গ্রীষ্মকাল। এ সময় প্রখর রোদ ওঠে। বৃষ্টি না থাকার জন্য থাকে প্রচণ্ড গরম। কখনো আসে কালবৈশাখি। এ সময় আম, কাঁঠাল, লিচু প্রভৃতি ফল বৃক্ষে শোভা পায়।

বর্ষাকাল: বর্ষা আসে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে অনবরত বৃষ্টি নিয়ে। এ সময় খালবিল, নদীনালা পানিতে ভরে যায়। কখনো দেখা দেয় বন্যা। তারপরও বর্ষাকাল প্রকৃতিকে সবুজ করে। এ সময় বিলে-বিলে পদ্ম ও শাপলা ফুল ফোটে।

শরৎকাল: ভাদ্র ও আশ্বিন দুই মাস শরৎকাল। নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা ভেসে বেড়ায়। মাঠে মাঠে সবুজ ফসল বাতাসে খেলা করে। শরতের সৌন্দর্য মানুষের মন ভোলায়। এ সময় শেফালি, মল্লিকা, কাশ, রজনীগন্ধা প্রভৃতি ফুল ফোটে।

হেমন্তকাল: কার্তিক ও অগ্রহায়ণ দুই মাস হেমন্তকাল। এ সময় মাঠে মাঠে ফসলের ছড়াছড়ি। কৃষকেরা ঘরে ঘরে ফসল তোলেন। এ সময় সবচেয়ে বেশি ধান উৎপাদন হয় বলে কৃষকের মুখে হাসি ফুটে।

শীতকাল: পৌষ ও মাঘ দুই মাস শীতকাল। প্রকৃতিকে কুয়াশার চাদর দিয়ে ঢাকতে শীতের আগমন ঘটে। শীতে দূর্ভোগ আসে গরিব মানুষের জীবনে। এ সময় বেগুন, মটরশুটি, আলু, কপি, টমেটো প্রভৃতি তরকারিসহ প্রচুর শাকসবজি ফলে।

বসন্তকাল: প্রকৃতির শেষ ঋতু বসন্ত। ফাল্গুন ও চৈত্র এই সময়ে যেন নতুন সাজে সেজে ওঠে। চারদিক ফুলে ফুলে ভরে যায়। এ সময় প্রকৃতির যে সৌন্দর্য তা আর কখনো দেখা যায় না।

উপসংহার: ছয় ঋতুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এখানকার জীবনধারায়ও পরিবর্তন ঘটে। বাংলাদেশের যে অপূর্ণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তা ঋতু বৈচিত্র্যের জন্যই। ঋতুর এই বৈচিত্র্য আছে বলেই আমাদের দেশ এত সুন্দর।

২৮. আমার প্রিয় ঋতু: বসন্তকাল

(পিটিআই সংসদ পরীক্ষণ বিদ্যালয়, নেত্রকোণা ২০২৬)

সংকেত: সূচনা; বসন্তের রূপ; বসন্ত উৎসব; সুবিধা; উপসংহার।

সূচনা: ঋতু বদলের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিতে পরিবর্তন দেখা যায়। শীতের পরেই আসে বসন্ত। বসন্তকালকে ঋতুরাজ বলা হয়। বসন্ত ঋতুই সবচেয়ে মনোরম ও সৌন্দর্যের ঋতু বলে সকলের কাছে নন্দিত। ফাল্গুন ও চৈত্র দুই মাস বসন্তকাল।

বসন্তের রূপ: বসন্ত আসে নতুন প্রাণ, নতুন উৎসাহ ও নতুন উদ্দীপনা নিয়ে। বসন্তে নানা ধরনের ফুলের সমারোহ দেখা যায়। গোলাপ, বেলি, চাঁপা আর আমের মুকুলের মিষ্টি গন্ধে ভরে যায় বাংলার প্রকৃতি। শিমুল, পলাশ আর কৃষ্ণচূড়ার শাখায় লাল রঙের ফুলের আগুন জ্বলে ওঠে। এ সময় কোকিলের মন মাতানো সুরে প্রাণ ভরে যায়। পাছে পাছে কচি সবুজ পাতা বের হয়।

বসন্তের প্রকৃতি শুধু যে মধুর ও মোলায়েম তা নয়, অনেক সময় তা বৃষ্ণ ও কঠিন হয়ে ওঠে। এ সময় মাঠ থাকে ফসলহীন, আকাশ থাকে নির্মোহ। চৈত্রের আকাশে আগুন ঝরে। কালবৈশাখির নগ্ননৃত্য এ সময় জীবন তখনই করে দিয়ে যায়।

বসন্ত উৎসব: বসন্তের আগমনে বাঙালির জীবনে লাগে উৎসবের ছোঁয়া। এ সময় তরুণ-তরুণীরা বাসন্তী রঙের পোশাকে সাজে। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে সরস্বতী পূজা, বাসন্তী পূজা, দোলযাত্রা ইত্যাদির আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে। এ রকম উৎসবের আমেজ বিরাজ করে বলেই বসন্ত ঋতু আমার প্রিয়।

সুবিধা: বসন্ত ঋতুতে চারদিকে নতুন পাতা ও ফুলের শোভা বিরাজ করে। প্রকৃতি যেন এক ভিন্ন আমেজে নিয়ে বিরাজ করে। প্রকৃতি নতুন রূপ মেতে ওঠে। টাটকা সবজি-ফুল-ফল সবার মন আনন্দে ভরিয়ে তোলে।

উপসংহার: বসন্ত হলো ঋতুরাজ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিক থেকে বসন্তই আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ ঋতু। ফুল, ফল ও পাখির গান নিয়ে বাংলাদেশের বসন্ত। ঋতুটি যে 'ঋতুরাজ' তা যথার্থই।

২৯. বর্ষাকাল

বা বাংলাদেশের বর্ষাকাল (পি.পি.স.প. ১৮, ১৭, ১৬, ১৫)

সংকেত: ভূমিকা; বর্ষার প্রকৃতি; বর্ষার ফুল-ফল; বর্ষার নদীনালা; উপসংহার।

ভূমিকা: বাংলাদেশ ঋতু বৈচিত্র্যের দেশ। ষড়ঋতুর বিচিত্র সমারোহে সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়েছে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি এই বাংলাদেশ। ছয় ঋতুর মধ্যে বর্ষা একটি উল্লেখযোগ্য ঋতু। আষাঢ় ও শ্রাবণ দুই মাস বর্ষাকাল। এ সময় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় বলে, একে বর্ষাকাল বলা হয়।

বর্ষার প্রকৃতি: বর্ষার আঝের বৃষ্টিও ধারায় শুকিয়ে যাওয়া নদীনালা, খাল-বিল, দিঘি, পুকুর কানায় কানায় ভরে ওঠে। গাছের পাতা সবুজ রং ধারণ করে। চারদিকে চোখ মেলেলেই দেখা যায় সবুজ আর সবুজ। বর্ষায় সারাদিন বৃষ্টির কারণে ঘর থেকে বেরোবার উপায় থাকে না। এ সময় গ্রামের পথঘাট কাদায় ভরে ওঠে।

বর্ষার ফুল-ফল: বর্ষায় খালে-বিলে পদ্ম, শাপলা, কলমি ইত্যাদি ফুল ফোটে। ডাঙায় ফোটে কদম, কেয়া, হিজল, বেলি, গন্ধরাজ ইত্যাদি ফুল। বর্ষাকালে পেয়ারা, জাম, আতা, বাতাবি, লেবু, আমড়া, লটকন ইত্যাদি ফল পাওয়া যায়।

বর্ষার নদীনালা: বর্ষায় প্রকৃতি এক নতুন সাজে সজ্জিত হয়। নদীনালা পানিতে ঝই ঝই করে। তাছাড়া ফুলে ফলে এ ঋতু এক নতুন সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। বর্ষার পানি ময়লা-আবর্জনা ধুয়ে পরিবেশকে নির্মল করে। এ সময় নদীর পানির সঙ্গে পলি এসে জমির উর্বরতা বাড়ায়। বর্ষায় আউশ ধান, পাট, আখ ইত্যাদি ফসল কাটা হয়। এ সময় খালে-বিলে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়।

উপসংহার: কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের বর্ষাকাল অবশ্যই আশীর্বাদ। বর্ষাই বাংলাদেশকে করেছে সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা। তাই বর্ষা ঋতুর ভূমিকা অপরিসীম। এ দেশের প্রধান ফসল ধান ও পাটের ফলন নির্ভর করে প্রচুর বৃষ্টিপাতের উপর। বর্ষা আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বাংলাদেশের ষড়ঋতুকে বৈচিত্র্যমণ্ডিত করেছে এই বর্ষাকাল।

৩০. গ্রীষ্মকাল

সংকেত: ভূমিকা; প্রকৃতির রূপ; গ্রীষ্মকালীন ফল; উপসংহার।

ভূমিকা: বাংলাদেশ ষড়ঋতুর দেশ। ছয়টি ঋতুর মধ্যে গ্রীষ্মকাল প্রথম। পহেলা বৈশাখে নববর্ষের উৎসবের আমেজ নিয়ে গ্রীষ্মের আগমন হয়। বসন্তের বর্ণিল রূপের পর গ্রীষ্মকাল আসে ঝা ঝা রোদ নিয়ে। কালবৈশাখি ঝড়ের সঙ্গে গ্রীষ্মকাল এসে প্রকৃতিকে সাজায় ভিন্ন রূপে।

আমাদের দেশে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ এই দুই মাস মিলে গ্রীষ্মকাল। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ নিয়ে গ্রীষ্মকাল হলো বর্ষাকালের গ্রীষ্মের প্রভাব অনুভব করা যায়। বৈশাখের বৃষ্ণ-বৃষ্ণ পরিবেশ প্রকৃতিকে প্রাণহীন ও বিবর্ণ করে তোলে।

প্রকৃতির বৃষ্ণ: গ্রীষ্মকালে প্রকৃতিতে সূর্যের প্রখর তাপ বিরাজ করে। এ ঋতুতে দিন বড়ো আর রাত ছোটো হয়। গ্রীষ্মে সূর্যের প্রচণ্ড তাপ বাতাসেও অনুভূত হয়। প্রখর রোদে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়। নদীনালা, খাল-বিল, জলাশয়ের পানি বাষ্প হয়ে বাতাসে উড়ে যায়। তাই এ সময় বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকে। অপরূপ শোভা স্বরিয়ে প্রকৃতি এ সময় বিবর্ণ, প্রাণহীন, নীরস হয়ে পড়ে। চারদিকে শূন্যতা ও হাছকার নেমে আসে।

গ্রীষ্মকালীন ফল: গ্রীষ্ম ঋতুতে প্রকৃতি বৃক্ষ হয়ে পড়লেও এ সময় প্রচুর ফল পাওয়া যায়। জাতীয় ফল কাঁঠাল গ্রীষ্মকালেই ফলে। এছাড়া আম, জাম, লিচু, তুরমুজ, বাঙ্গি, আনারস, পেঁপে, জামরুল, পেয়ারা, সফেদা, আতা, কামরাঙা, তাল ইত্যাদি ফলের ধুম পড়ে যায়। এ কারণে ঋতুটি মধুমাস নামে পরিচিত। মুখরোচক এসব ফল আমাদের জন্য প্রাশস্তি নিয়ে আসে।

উপসংহার: প্রকৃতির হাছকারই গ্রীষ্মের নিত্যরূপ। কালবৈশাখি ঋতুর অভাব এ সময় প্রকৃতি লব্ধভক্ত করে দেয়। গ্রীষ্মের দুঃসহ তাপদাহে মানুষ বৃষ্টির বন্দনা করে। ফসলের জন্য কৃষকের দৃষ্টি থাকে আকাশের দিকে। বর্ষার সিন্ধতার জন্য প্রাণ কাঁদে সকলের।

৩১. শীতকাল /গ্র.সি.স.প. ১৯, ১৮, ১৭/

সংকেত: সূচনা; সময়কাল; প্রকৃতির বর্ণনা; শীতের সুবিধা ও অসুবিধা; উপসংহার।

সূচনা: ঋতুচক্রের দেশ বাংলাদেশ। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত—এ ষড়ঋতু বাংলায় বয়ে আনে রকমারি রূপ। ঋতু আসে, ঋতু যায়—প্রকৃতি সাজে নানা রঙে নানা সাজে। এমনই ধারাবাহিকতায় হেমন্তের পর আসে শীত। শীত বাংলাদেশে আসে রিক্ততার বৃষ্ণ ধারণ করে। বন-বনানীর পাতা ঝরার বার্তা বয়ে আনে শীতকাল।

সময়কাল: পৌষ-মাঘ দুই মাস শীতকাল হলেও অগ্রহায়ণ মাস থেকেই শুরু হয়ে যায় শীতের আনাগোনা। তবে হাড় কাঁপানো শীত বলতে যা বোঝায় তার দেখা পাওয়া যায় পৌষ-মাঘ মাসে।

প্রকৃতির বর্ণনা: শীতকালে কুয়াশা আর শিশির পড়ে। এ সময় দিন ছোটো ও রাত বড়ো হয়। উত্তর দিক থেকে হিমেল হাওয়া বইতে থাকে। ফলে শীতের তীব্রতা আরও বেড়ে যায়। শীতকালে পশু, পাখি ও গাছপালার মধ্যে নিজেবিতা দেখা দেয়। এ সময় গাছের পাতা ঝরে পড়ে প্রকৃতি যেন নগ্নরূপ ধারণ করে। তবে এ দেশে এর একটা নিজস্ব সৌন্দর্য রয়েছে। এ সময় আম ও জাম গাছে মুকুল দেখা যায়। এ ঋতুতে আলু, তিসি ও সরিষাসহ নানারকম শাকসবজি চাষ করা হয়।

শীতের সুবিধা ও অসুবিধা: কুয়াশা আর শিশিরে ভেজা শীত সবুজ ফসলের বনয় বইয়ে দেয়। এ সময় চাষিদের আমন ধান কাটার ধুম পড়ে যায়। শীতে নানারকম শাকসবজির সমারোহ দেখা যায়। শীতকালে কমলাপেঁপে, জলপাই, কামরাঙা, সফেদা ইত্যাদি ফল শীতের উপহার হিসেবে বাজারে আসে। এ সময় গাঁদা, গোলাপ, ডালিয়া, সূর্যমুখী ইত্যাদি রবেরঙের ফুলে বাগান ভরে যায়। শীতে খেজুরের রস পাওয়া যায়। এ রস দিয়ে পিঠাপুলি খাওয়ার ধুম পড়ে যায়। তবে দরিদ্র মানুষের জীবনে শীত সবচেয়ে বেদনাবহুল ঋতু। হাড় কাঁপানো শীতে তাদের দুঃখের সীমা থাকে না। শীতকালে পৌষ-পার্বণ অনুষ্ঠিত হয়।

উপসংহার: শীতকাল মানুষের জন্য কিছুটা সুখের হলেও গরিবদের বেলায় তা খুব কষ্টের। তাদের প্রয়োজনীয় শীতবস্ত্র না থাকার কারণে তারা শীতকালে অতি কষ্টে জীবন কাটায়।

৩২. শীতের সকাল /গ্র.সি.স.প. ১৯, ১৮, ১৭/

সংকেত: সূচনা; শীতের সকালের প্রকৃতি; শীতের সকালে গ্রামগঞ্জ; শীতের সকালে শহর; সুবিধা-অসুবিধা; উপসংহার।

সূচনা: বাংলাদেশ ঋতুচক্রের দেশ। ঋতুচক্রের আবর্তে এ দেশে শীত আসে নিঃশব্দে। আবার চলেও যায় ধীরে ধীরে। উত্তরের হিমেল হাওয়ায় হাড় কাঁপানো শীতের তীব্রতা নিয়ে শীত আসে এবং প্রকৃতিকে নিঃস্ব করে দিয়ে বিদায় নেয়। তবু শীতের একটা নিজস্ব সৌন্দর্য আছে, যা আমাদের মুগ্ধ করে।

শীতের সকালের প্রকৃতি: শীতের সকাল আসে কুয়াশার চাদর মুড়ি দিয়ে। প্রকৃতি ঢাকা থাকে কুয়াশার আড়ালে। সূর্যের আলো যখন ভোরের শিশিরের উপর পড়ে তখন এর অপরূপ সৌন্দর্য চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। এ সময় বাগানে ফোটে গাঁদা, কলাবতি, পলাশ, ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা প্রকৃতি ফুলগাছ। শিশির ভেজা প্রকৃতির সর্বত্র কনকনে শীত অনুভূত হয়। লেপ কিংবা কাঁথা ছেড়ে কিছুতেই উঠতে ইচ্ছা হয় না।

শীতের সকালে গ্রামগঞ্জ: তীব্র শীত উপেক্ষা করে খুব সকালে গ্রামের মানুষ ফসলের মাঠে কাজে যায়। বধূরা খুব ভোরে উঠেই ধান মাড়াই, ধান সিন্ধ ইত্যাদি কাজ শুরু করে। পাছিরা খেজুর পাছ থেকে রসের ডাঁড় নামায়। সূর্যের মুখ না দেখা পর্যন্ত অনেকে আগুন পোহায়।

শীতের সকালে শহর: শীতের সকালে গ্রামের প্রকৃতির মাঝে যে অভূতপূর্ব দৃশ্য চোখে পড়ে, শহরের ইট-পাথর ঘেরা কৃত্রিম পরিবেশে তার আভাস নেই। প্রতিদিনের স্বাভাবিক ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে শুরু হয় শহরের শীতের সকাল। কুয়াশার ভিতরে হেডলাইট জ্বালিয়ে পাড়িগুলো চলাচল করে। রাস্তার মোড়ের চায়ের দোকানগুলোতে ভিড় জমে ওঠে।

সুবিধা-অসুবিধা: শীতের সকাল নানারকম আনন্দ-আয়োজনের উপলক্ষ্য এনে দেয়। পিঠা-পায়েস শীতকালের এক লোভনীয় খাদ্য। খেজুর রসের পিঠা-পায়েস এ সময়ের এক অনন্য উপহার। এ সময় ভাপা, চিতই, পুলি, পাটিসাপটা ইত্যাদি মজাদার পিঠার আমেজে শীতের সকাল বেশ জমে ওঠে। গরিব-দুঃখী মানুষের জন্য শীতের সকাল কষ্টদায়ক। শীতবস্ত্রের অভাবে তারা খুব কষ্ট পায়।

উপসংহার: শীতের সকাল তেমন দীর্ঘস্থায়ী হয় না। একসময় সূর্য ওঠে, রোদ ছড়িয়ে উত্তাপ বাড়তে থাকে প্রকৃতির। শীতের প্রভাব কাটিয়ে শুরু হয় কর্মমুখর জীবনের ব্যস্ততা।

ব্যক্তি

৩৩. হজরত মুহাম্মদ (স)

সংকেত: ভূমিকা; জন্ম ও বংশ পরিচয়; শৈশবকাল; নবুয়ত প্রাপ্তি; ধর্মপ্রচার; আদর্শ চরিত্র; উপসংহার।

ভূমিকা: হজরত মুহাম্মদ (স) সত্য বাণী প্রচারের মাধ্যমে মানুষকে কল্যাণের পথে আনেন। আল্লাহ তাঁকে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি হিসেবে প্রেরণ করেন।

জন্ম ও বংশ পরিচয়: হজরত মুহাম্মদ (স) আরবের মক্কা নগরের কোরাইশ বংশে ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম আবদুল্লাহ এবং মায়ের নাম আমিনা। তাঁর জন্মের আগেই বাবা মৃত্যুবরণ করেন। ছয় বছর বয়সে তিনি মাকেও হারান।

শৈশবকাল: হজরত মুহাম্মদ (স)-এর দাদা আবদুল মুত্তালিব তাঁকে লালনপালন করেন। দাদার মৃত্যুর পর চাচা আবু তালিবের গৃহে তিনি প্রতিপালিত হন। ব্যবসায়বাণিজ্য উপলক্ষ্যে তাঁর চাচা প্রায়ই তাঁকে সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ায় নিয়ে যেতেন।

নবুয়ত প্রাপ্তি: হজরত মুহাম্মদ (স) ৪০ বছর বয়সে হজরত জিব্রাইল (আ.)-এর মাধ্যমে আল্লাহর বাণী লাভ করেন। আল্লাহ তাঁকে নবিরূপে ঘোষণা করেন এবং তাঁর ওপর পবিত্র কুরআন নাজিল করতে থাকেন।

ধর্মপ্রচার: আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই; হজরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহর প্রেরিত রাসূল—বহু বাখার সম্মুখীন হয়েও তিনি এই সত্য বাণী প্রচার করেন। আদর্শ চরিত্র: হজরত মুহাম্মদ (স) ছিলেন মহান চরিত্রের অধিকারী। তিনি ছিলেন সদালাপী, মিষ্টভাষী, সত্যবাদী, মিতব্যয়ী ও চিন্তাশীল। সভাবাদিতার জন্য লোকে তাঁকে 'আল-আমিন' বা 'বিশ্বাসী' বলে ডাকত।

উপসংহার: হজরত মুহাম্মদ (স) আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় মানুষ, আমার আদর্শ মহাপুরুষ। ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দের ১২ রবিউল আউয়াল তিনি ইন্তেকাল করেন।

১২২ পাঞ্জেরী প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা সহায়িকা। পরীক্ষা ২০২৬

৩৪. বাংলাদেশের জাতীয় কবি ক/ আমার প্রিয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ক/ আমার প্রিয় লেখক

[প্র. সি. স. প.-১০১]

সংকেত: সূচনা; জীবনী; সাহিত্যকর্ম; পারিবারিক জীবন; শেষ জীবন; উপসংহার।

সূচনা: বাংলা সাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলাম 'বিদ্রোহী কবি' হিসেবে সমধিক পরিচিত। তাঁর রচনায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও নিপীড়িত মানুষের মুক্তির আশিষ ধ্বনিত হয়েছে।

জীবনী: কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ মে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

মাত্র আট বছর বয়সে মা-বাবাকে হারিয়ে দুঃখকষ্টে তাঁর বাল্যজীবন কাটে। তিনি গ্রামের মক্তবে বাংলা, আরবি ও ফারসি ভাষা শেখেন। গানবাজনার দিকে ঝোঁক থাকায় লেখাপড়া ছেড়ে একদিন 'লেটো' গানের দলে যোগ দেন। তারপর আসানসোলে এক ব্লুটির দোকানে কাজ নেন।

ময়মনসিংহের ত্রিশালের এক ভট্টলোক তখন আসানসোলের পুলিশ কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি নজরুলের প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তাঁকে নিজ গ্রাম ময়মনসিংহের দরিরামপুর হাই স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন।

১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে কবি সৈন্যদলে ভর্তি হন। কিছুদিনের মধ্যেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে তাকে রণাঙ্গনে যেতে হয়।

সাহিত্যকর্ম: বিশ্বযুদ্ধ থেমে গেলে কলকাতায় ফিরে নজরুলের সাহিত্যিক জীবন শুরু হয়। অল্পসময়ের মধ্যেই তিনি কবি হিসেবে পরিচিতি পান। তাঁর 'দোলনচাঁপা', 'বুলবুল', 'কিঙ্ককুল', 'ভাঙার গান', 'বিয়ের বাঁশী', 'অগ্নি-বীণা' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তা ছাড়া 'আলোয়া', 'কিলিমিলি', 'পুতুলের বিয়ে' ইত্যাদি নাটক এবং 'বাঁধনহারা', 'মৃত্যুফুধা', 'কুহেলিকা' ইত্যাদি উপন্যাস তাঁর গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টি। নজরুল বহু গান লিখেছেন এবং তাতে সুর দিয়েছেন। 'ধুমকেতু' ও 'লাঙল' নামে দুইটি প্রতিকাও সম্পাদনা করেন তিনি।

পারিবারিক জীবন: নজরুলের স্ত্রীর নাম প্রমীলা। বড়ো ছেলে বুলবুল শৈশবেই মারা যায়। অন্য দুই ছেদের নাম কাজী সব্যসাচী ও কাজী অনিরুদ্ধ।

শেষ জীবন: ১৯৪২ সালে নজরুল দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন। ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট ঢাকার পিজি হাসপাতালে কবি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

উপসংহার: কাজী নজরুল ইসলাম বিদ্রোহের কবি, মানবতার কবি। তিনিই আমাদের জাতীয় কবি। বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়।

৩৫. বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখ

সংকেত: ভূমিকা; জন্ম ও বংশ পরিচয়; শিক্ষা ও কর্মজীবন; মুক্তিযুদ্ধে তাঁর আত্মত্যাগ ও অবদান; উপসংহার।

ভূমিকা: পাকিস্তানি শত্রুদের হাত থেকে প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে মুক্ত করার জন্য ১৯৭১ সালে এ দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁদের প্রাণ উৎসর্গ করেন। দেশমাতৃকার জন্য প্রাণত্যাগকারী ৭ জন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে সরকার 'বীরশ্রেষ্ঠ' খেতাবে ভূষিত করেন। এদের মধ্যে একজন বীরশ্রেষ্ঠ হলেন নূর মোহাম্মদ শেখ।

জন্ম ও বংশ পরিচয়: ১৯৩৬ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি নড়াইলের মহিমখোলা গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন খুব দুরন্ত। বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান তিনি। কিন্তু কিশোর বয়সেই তাঁর বাবা-মা মারা যান।

শিক্ষা ও কর্মজীবন: কিশোর বয়সে মা-বাবা মারা যাওয়ায় তিনি যোগ দেন ইপিআর অর্থাৎ ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি অন্যান্য বাঙালির মতো মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিলেন।

মুক্তিযুদ্ধে তাঁর আত্মত্যাগ ও অবদান: সময়টা ছিল ১৯৭১ সালের ৫ সেপ্টেম্বর। যশোরে পাকিস্তানি ছুটিপুর ক্যাম্পে অবস্থান করছিল পাকিস্তানি সেনা আর কয়েকজন রাজাকার। একটু দূরে গোয়ালখাটি গ্রামে টহল দিচ্ছিলেন পাঁচ মুক্তিযোদ্ধা। এদেরই নেতৃত্বে ছিলেন ল্যান্সনায়ক নূর

মোহাম্মদ শেখ। পাকিস্তানি সৈন্য তাঁদের অবস্থান টের পেয়ে রাজাকারদের সহায়তায় তিন দিক থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের ঘিরে ফেলে। এ দলে ছিলেন অসীম সাহসী মুক্তিযোদ্ধা নান্নু মিয়া। তিনি একটা হালকা মেশিনগান থেকে গুলি ছুড়তে ছুড়তে এগিয়ে গেলে প্রতিপক্ষের একটা গুলি এসে লাগে তাঁর গায়ে। নূর মোহাম্মদ তাঁকে এক হাত দিয়ে কাঁধে তুলে নিয়ে অন্য হাতে গুলি চালাতে থাকেন। কিন্তু হঠাৎ মটারের একটি গুলি এসে লাগল তাঁর পায়ে। গোলায় আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল তাঁর পা। তিনি বুঝতে পারলেন মৃত্যু আসন্ন। তিনি তখন সজ্ঞা সিপাহি মোস্তফা কামালকে বললেন নান্নু মিয়াকে নিয়ে আস্তে আস্তে সরে যেতে। আর তিনি মোস্তফার রাইফেল দিয়ে যতক্ষণ সম্ভব গুলি চালাতে চালাতে শহিদ হলেন।

উপসংহার: মুক্তিযুদ্ধে মহান আত্মত্যাগের মাধ্যমে তিনি বাঙালির হৃদয়াকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে রইলেন। তাঁর এ অসামান্য ত্যাগ ও অবদানের জন্য তাঁকে বীরশ্রেষ্ঠ খেতাবে ভূষিত করা হয়।

৩৬. বীরশ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ রুহুল আমিন

সংকেত: ভূমিকা; জন্ম ও বংশ পরিচয়; বীরশ্রেষ্ঠ উপাধি লাভ; মুক্তিযুদ্ধে রুহুল আমিনের অবদান; উপসংহার।

ভূমিকা: ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জনের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতা অর্জন করতে এ দেশের অগণিত মানুষকে যুদ্ধ করতে হয়েছে, প্রাণ দিতে হয়েছে। তাঁদের মধ্য থেকে সাতজনকে দেওয়া হয়েছে 'বীরশ্রেষ্ঠ' উপাধি। মোহাম্মদ রুহুল আমিন বীরশ্রেষ্ঠদের একজন।

জন্ম ও বংশ পরিচয়: মোহাম্মদ রুহুল আমিন ১৯৩৫ সালে নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ি উপজেলার বাঘচাপড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আজহার পাটোয়ারী এবং মাতার নাম জোলেখা খাতুন। তিনি ছিলেন বাবা-মায়ের প্রথম সন্তান। তাঁরা ছিলেন ছয় ভাইবোন।

বীরশ্রেষ্ঠ উপাধি লাভ: মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশ সরকার তাঁকেসহ মোট সাতজনকে বীরত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাধি বীরশ্রেষ্ঠ উপাধি দেয়।

মুক্তিযুদ্ধে রুহুল আমিনের অবদান: দিনটি ছিল ১৯৭১ সালের ১০ ডিসেম্বর। মুক্তিযুদ্ধ শেষ হতে আর মাত্র কয়েক দিন বাকি। মুক্তিযোদ্ধাদের নৌজাহাজ বিএনএস পলাশ এবং বিএনএস পদ্মা মোংলা বন্দর দখল করে নিয়েছে। তাঁদের পরবর্তী লক্ষ্য খুলনা দখল করা। খুলনার দিকে ধেয়ে আসছে তাঁরা। ডৈরব নদী বেয়ে দুইটি জাহাজ খুলনা শিপইয়ার্ডের কাছাকাছি আসতেই বোমারু বিমান থেকে জাহাজ দুইটির উপর বোমা এসে পড়ে। রুহুল আমিন বিএনএস পলাশ থেকে ঝাপ দিয়ে নদী সাতারে পাড়ে উঠলেন। বোমারু আঘাত থেকে তিনি রক্ষা পেলেন। কিন্তু রাজাকারদের হাতে তাঁর মৃত্যু হলো। নদীতীরে তখন রাজাকার-আলবদররা অবস্থান করছিল। তারাই তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে। শহিদ হলেন বীরশ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ রুহুল আমিন। খুলনা শিপইয়ার্ডের কাছেই চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন এই বীর মুক্তিযোদ্ধা। এখানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছে।

উপসংহার: মহান বীরত্ব ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে তিনি বাঙালির হৃদয়ে অমর হয়ে আছেন এবং থাকবেন। তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য সরকার তাঁকে বীরশ্রেষ্ঠ খেতাবে ভূষিত করে।

৩৭. শহিদ মীর মুন্স

সংকেত: ভূমিকা; ব্যক্তিগত জীবন; বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা; খেতাবে শহিদ হন; প্রতিক্রিয়া; উপসংহার।

ভূমিকা: শহিদ মীর মুন্স ২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের এক অকুতোভয়া বীর। তাঁর পুরো নাম মীর মাহফুজুর রহমান মুন্স। তিনি সরকারি চাকরিতে কোটা বৈষম্যের সংস্কার আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে শহিদ হন।

ব্যক্তিগত জীবন: মীর মুন্স ১৯৯৮ সালে ঢাকার উত্তরায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম মীর মোস্তাফিজুর রহমান ও মায়ের নাম শাহনা চৌধুরী। তিনি ২০২৩ সালে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিত বিষয়ে স্নাতক পাশ করেন। ভ্রমণপিপাসু শহিদ মীর মুন্স পেশাজীবনে ছিলেন একজন সফল ফ্রিল্যান্সার। পরবর্তীকালে তিনি বাংলাদেশ স্কাউটের সদস্যপদ লাভ করেছিলেন।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা: ছাত্রদের ন্যায্য আন্দোলনে মীর মুন্সু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তিনি আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের পানি এবং বিস্কুট বিতরণ করে তাদের উদ্বুদ্ধ করেছেন।

যেভাবে শহিদ হন: ২০২৪ সালের ১৮ জুলাই ঢাকার উত্তরায় কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন চলছিল। মুন্সু আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে 'কারো পানি লাগবে ভাই, পানি?' বলে খাবার পানি বিতরণ করছিলেন। আন্দোলন দমন করতে পুলিশ সেখানে টিয়ার গ্যাস ছোড়ে এবং গুলি করে। তখন তিনি গুলিবিদ্ধ হন। দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তাররা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

প্রতিক্রিয়া: মীর মুন্সু শহিদ হওয়ায় তাঁর যমজ ভাই মীর সিন্ধু ফেসবুকে একটি ভিডিও পোস্ট করেন। সেই ভিডিও সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। আন্দোলনে শহিদ হওয়া মুন্সুর সেই ভিডিও দেখে সাধারণ মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়ে। আন্দোলনে মানুষের সম্পৃক্ততা বেড়ে যায়।

উপসংহার: শহিদ মীর মুন্সু ছাত্রদের অধিকারের জন্য জীবন দিয়েছেন। সত্য ও ন্যায়ের জন্য তাঁর এই আত্মত্যাগ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

৩৮. শহিদ আবু সাঈদ

সংক্ষেপ: ভূমিকা: ব্যক্তিগত জীবন: বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে ভূমিকা: যেভাবে শহিদ হন: উপসংহার।

ভূমিকা: ২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই আন্দোলনের এক অবিস্মরণীয় নাম আবু সাঈদ। ছাত্রদের ন্যায্য অধিকার আদায়ে অসীম সাহস দেখিয়ে আবু সাঈদ নিজের জীবন উৎসর্গ করেন।

ব্যক্তিগত জীবন: আবু সাঈদ ২০০১ সালে রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার বাকনপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মকবুল হোসেন ও মাতা মনোয়ারা বেগমের নয় সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার ছোটো। তিনি খালাশপীর হিন্দুী উচ্চ বিদ্যালয়, পীরগঞ্জ থেকে এসএসসি ও রংপুর সরকারি কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করেন এবং ২০২০ সালে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হন।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে ভূমিকা: আবু সাঈদ ২০২৪ সালে সংঘটিত বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম কর্মী ছিলেন। তিনি বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে শুরু থেকেই তিনি সোচ্চার ছিলেন। আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য তিনি ফেসবুকেও সক্রিয় ছিলেন।

যেভাবে শহিদ হন: ১৬ জুলাই ২০২৪, আন্দোলন চলাকালে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে পুলিশ ও আন্দোলনকারীদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। তখন পুলিশের হররা গুলিতে তিনি গুরুতর আহত হয়ে মাটিতে পুটিয়ে পড়েন। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। আবু সাঈদের বুক চিত্তিয়ে দুই হাত প্রসারিত করে পুলিশের গুলির সামনে ধাঁড়িয়ে থাকার চিত্রটি আন্দোলনকে আরও বেগবান করে।

উপসংহার: আবু সাঈদ একটি দৈন্যমহীন বাংলাদেশের জন্য জীবন দিয়েছেন। তাঁর আত্মত্যাগ বাংলাদেশের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

স্বাস্থ্য সুরক্ষা

৩৯. ডেঙ্গুজ্বর ও এর প্রতিকার

সংক্ষেপ: ভূমিকা: এডিস মশার পরিচয়; উপসর্গ; চিকিৎসা পদ্ধতি; প্রতিরোধ; উপসংহার।

ভূমিকা: বর্তমান সময়ে একটি আতঙ্কের নাম 'ডেঙ্গুজ্বর'। আর এ রোগের বাহক হলো 'এডিস' নামক বিশেষ একধরনের মশা। বর্তমানে অসংখ্য মানুষ এ রোগে আক্রান্ত হচ্ছে এবং কেউ কেউ এতে মারাও যাচ্ছে।

এডিস মশার পরিচয়: এডিস মশা দেখতে গাঢ় নীলাভ-কালো রঙের। এ মশার সারা শরীরে সাদা-কালো ডোরাকাটা দাগ আছে। এর পা একটি লম্বাটে ধরনের। মূলত স্ত্রী এডিস মশা ডেঙ্গুজ্বরের ভাইরাস বহন করে থাকে। এডিস মশা সাধারণত খুব সকালে বা শেষ বিকালের দিকে বেশি আক্রমণ করে।

উপসর্গ: কোনো ব্যক্তি ডেঙ্গু মশা দ্বারা আক্রান্ত হলে চার থেকে ছয় দিনের মধ্যেই জ্বর আসে। ডেঙ্গুজ্বর হলে বমি, পেটব্যথা ও মাথাব্যথা, কোমরব্যথা, অস্থিসন্ধি বা জয়েন্ট ব্যথা, চোখের পিছনে ব্যথা, ত্বকে ছোটো ছোটো লাল ফুসকুড়ি দেখা দেওয়া এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে নড়াচড়ার ক্ষমতা পর্যন্ত হ্রাস পায়। এ সময় শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে রক্তক্ষরণ শুরু হয়।

চিকিৎসা পদ্ধতি: ডেঙ্গুজ্বর সন্দেহ হলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। এক্ষেত্রে সাধারণত জ্বর হওয়ার তিন দিনের মধ্যে সিবিডি এবং রক্তের প্রাটিলেট টেস্ট করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রাথমিক পর্যায়ের ডেঙ্গু হলে দিনে চারবার প্যারাসিটামল খেতে হবে। তাছাড়া বেশি করে পানি ও তরল খাবার খেতে হবে। যাদের রক্তের প্রাটিলেট কমে যাবে তাদের অনেক সময় রক্ত দিতে হতে পারে। এছাড়াও পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিতে হবে।

প্রতিরোধ: অনেক দিন জমে থাকা স্বচ্ছ পানিতে এডিস মশা বংশবৃদ্ধি করে। তাই বাড়ির আশেপাশের জমে থাকা এ ধরনের পানির উৎস ধ্বংস করতে হবে। বাড়ির চারপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। দিনে বা রাতে ঘুমানোর সময় মশারি ব্যবহার করতে হবে। সম্ভব হলে দরজা-জানালায় নেট ব্যবহার করতে হবে।

উপসংহার: বর্তমান সময়ে ডেঙ্গুজ্বর এক ভয়াবহ সংকট হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এ রোগ শুধু বাংলাদেশেই নয়, বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে, যা আশঙ্কার বিষয়। তাই এ সম্পর্কে সবাইকে সচেতন হতে হবে এবং ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করে যেতে হবে।

প্রকৃতি ও পরিবেশ

৪০. জলবায়ু পরিবর্তন

সংক্ষেপ: ভূমিকা: কারণসমূহ; প্রভাব; প্রতিকার; উপসংহার।

ভূমিকা: কোনো একটি স্থানের দীর্ঘদিনের আবহাওয়ার যে ধরন তাকে জলবায়ু বলা হয়। এই জলবায়ুতে যখন অস্বাভাবিক কোনো পরিবর্তন ঘটে তখন তাকে বলা হয় জলবায়ু পরিবর্তন।

কারণসমূহ: জলবায়ু পরিবর্তনের একটি বড়ো কারণ হচ্ছে গ্রিনহাউজ ইফেক্ট। বিশেষ কিছু প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট কারণ এই জলবায়ু পরিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা রাখে। ব্যাপকহারে গাছ কাটা, অপরিষ্কৃত নগরায়ণ ও যত্রতত্র কলকারখানা স্থাপনের কারণে জলবায়ুতে তার বিরূপ প্রভাব পড়ছে। শক্তি উৎপাদনের জন্য পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত বিপুল পরিমাণ জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো হয়। এতে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন ও নাইট্রোজেনসহ নানা ধরনের ক্ষতিকারক গ্যাস বৃদ্ধি পায়। দিনে দিনে গাছের পরিমাণ কমে যাওয়ায় ক্ষতিকর কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিশোধিত হয়ে অক্সিজেনে রূপান্তরিত হতে পারছে না। ফলে বায়ুমণ্ডল ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে।

প্রভাব: জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কারণে বন্যা, টর্নেডো, অঝড়ঝড় ও সাইক্লোনের মতো বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগও আশঙ্কাজনকহারে বাড়ছে। একইসাথে মেরু অঞ্চলের বরফ গলে সেখানকার জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হচ্ছে এবং সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেড়ে গিয়ে সমুদ্র তীরবর্তী এলাকার জন্য বড়ো ধরনের ঝুঁকি তৈরি করছে।

প্রতিকার: জলবায়ু পরিবর্তনের এই ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বাঁচতে হলে আমাদের সবাইকে সচেতন হতে হবে। এজন্য অপরিষ্কৃত নগরায়ণ বন্ধ করতে হবে। বন্ধ করতে হবে যত্রতত্র কলকারখানা স্থাপন। জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে প্রকৃতিবান্ধব বিকল্প জ্বালানি ব্যবহার করতে হবে। নির্বিচারে বৃক্ষনিধন না করে অধিক হারে গাছ লাগাতে হবে। ক্ষতিকর গ্যাসের ব্যবহার যথাসম্ভব কমিয়ে আনতে হবে।

উপসংহার: জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। তাই প্রকৃতির এ বিরূপ প্রভাব থেকে মুক্তি পেতে হলে মানুষের সজ্ঞে প্রকৃতির মেলবন্ধন গড়ে তুলতে হবে। তাহলেই আমরা আমাদের জন্য একটি সুন্দর ও নিরাপদ পৃথিবী গড়ে তুলতে পারব।

৪১. বৃক্ষরোপণ অভিযান

বা/ বৃক্ষরোপণ /প্র. দি. স. প. ১৯, ১৬/

সংকেত: সূচনা; বৃক্ষরোপণের উপযুক্ত সময়; আমাদের করণীয় ও পরিচর্যা; বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা; উপসংহার।

সূচনা: বৃক্ষ বা গাছপালা মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু। মানবজাতির কল্যাণ ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষের অবদান অসামান্য। বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে আমাদের দেশেও রোগান উঠেছে, 'গাছ লাগান— পরিবেশ বাঁচান'।

বৃক্ষরোপণের উপযুক্ত সময়: সাধারণত বর্ষার প্রারম্ভে গাছের চারা রোপণের প্রকৃতি শুরু হয়। তবে চারা রোপণের উত্তম সময় জুন থেকে আগস্ট মাস। বৃক্ষরোপণের জন্য আদর্শ ও মানসম্মত চারা নির্বাচন করতে হয়। এরপর উপযুক্ত জায়গা নির্বাচন করে চারা রোপণ করতে হয়।

আমাদের করণীয় ও পরিচর্যা: বৃক্ষরোপণ অভিযান সফল করার জন্য সরকারের পাশাপাশি জনগণকেও এগিয়ে আসতে হবে। গাছ না লাগিয়ে যদি কেবল কেটে ফেলা হয় তাহলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে জীবনের অন্তিম ভূমিকির সম্মুখীন হবে। এজন্য বৃক্ষরোপণে সমাজের সর্বস্তরের লোকজনকে উৎসাহিত করতে হবে। বৃক্ষরোপণের পর চারার গোড়ায় সেচ ও পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। চারার গোড়া আগাছামুক্ত রাখতে হবে। চারার গোড়ার মাটি শক্ত হয়ে গেলে তা আলগা করে দিতে হবে। চারার দূত বৃক্ষের জন্য রোপণের এক মাস পর গোড়ার এক ফুট দূরে নালা তৈরি করে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে।

বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা: আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাতে গাছের মতো অবদান আর কারো নেই। গাছ থেকেই আমরা পাই ফল, ফুল, জীবনধারণের জন্য খাদ্য, বস্ত্র তৈরির তুলা, বাসগৃহ ও আসবাবপত্র নির্মাণের প্রয়োজনীয় কাঠ। বৃক্ষ জীবন রক্ষাকারী অক্সিজেন দেয় এবং বিষাক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে। বৃক্ষ থেকে আমাদের জীবনরক্ষাকারী নানারকম গুণবহু তৈরি হয়। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করে পৃথিবীকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করে এই বৃক্ষ। একটি দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য শতকরা ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা আবশ্যিক।

উপসংহার: মানুষ ও প্রাণিকুলের জন্য বৃক্ষরোপণ অভিযান একটি মহৎ পদক্ষেপ। এ অভিযান সফল হলে আমাদের জীবন সমৃদ্ধ হবে এবং দেশ ভরে উঠবে সবুজের সমারোহে।

সমস্যা ও প্রতিকার

৪২. শব্দদূষণ ও তার প্রতিকার /প্র. দি. স. প. ১৯/

সংকেত: সূচনা; শব্দদূষণের কারণ; শব্দদূষণের অপকারিতা; প্রতিকার; উপসংহার।

সূচনা: যখন আমাদের চারপাশে সহনীয় মাত্রার চেয়ে বেশি শব্দ সৃষ্টি হয় তখন তাকে শব্দদূষণ বলে। মানুষের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য দূষণমুক্ত পরিবেশ খুব জরুরি। কিন্তু আমরা প্রতিদিন বিভিন্নভাবে পরিবেশকে দূষিত করে চলছি। পরিবেশ দূষণের নানা দিকের মধ্যে শব্দদূষণ অন্যতম।

শব্দদূষণের কারণ: বিভিন্ন কারণে শব্দদূষণ ঘটে থাকে। গাড়ির হর্ন, কলকারখানার শব্দ, জোরে জোরে মাইক বাজানো, লাউড স্পিকারে গান শোনা প্রভৃতি কারণে শব্দদূষণ হয়।

শব্দদূষণের অপকারিতা: শব্দদূষণ আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ। মাত্রাতিরিক্ত শব্দ আমাদের মস্তিষ্কে প্রভাব ফেলে। এতে দিনদিন আমাদের শ্রবণ ক্ষমতা কমে যেতে থাকে। অতিরিক্ত শব্দের প্রভাবে একসময় বধির হয়ে যাওয়ার শঙ্কা দেখা দেয়।

প্রতিকার: শব্দদূষণের ক্ষতিকর দিকগুলো বিবেচনা করে আমাদের উচিত এর প্রতিকার করা। এজন্য মাত্রাতিরিক্ত শব্দ সৃষ্টি করে এমন জিনিস পরিহার করা উচিত। এছাড়া জোরে জোরে মাইকে গান শোনা থেকে আমাদের বিরত থাকা উচিত। অথবা গাড়ির হর্ন বাজানো বন্ধ করা এবং স্কুল ও হাসপাতালের সামনে হর্ন না বাজানো থেকে বিরত থাকা দরকার। এতে শব্দদূষণ থেকে মানুষ মুক্তি পাবে এবং তাদের স্বাস্থ্যরক্ষা কম হবে।

উপসংহার: শব্দদূষণ আমাদের শরীরের ওপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব ফেলে। শব্দদূষণের ফলে আমাদের বধিরতার হার বেড়ে যায়। তাই আমাদের সকলের উচিত শব্দদূষণ ঘটে এমন কাজ পরিহার করা।

৪৩. পরিবেশ দূষণ ও তার প্রতিকার /প্র. দি. স. প. ১৯, ১৮/

সংকেত: ভূমিকা; পরিবেশ দূষণের কারণ; পরিবেশ দূষণের প্রতিকার; পরিবেশ দূষণরোধে পদক্ষেপ; উপসংহার।

ভূমিকা: প্রকৃতির অনুকূল পরিবেশ মানুষের অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য। নির্মল বাতাস, বিশুদ্ধ পানি ও পর্যাপ্ত খাদ্য মানুষকে সুস্থ ও সুন্দরভাবে বাঁচতে সহায়তা করে। কিন্তু মানুষের হাতে দূষিত হচ্ছে জীবনের অপরিহার্য উপাদান পানি ও বায়ু। পরিবেশ দূষণের মারাত্মক সমস্যা মানুষের জীবনকে ঠেলে দিয়েছে সর্বনাশ। ভূমিকির মুখে।

পরিবেশ দূষণের কারণ: পরিবেশ দূষণের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে। পরিবেশ দূষণের একটি বড়ো কারণ পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্যের চাহিদা মেটাতে ভূমিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে কৃত্রিম সার ও কীটনাশকের ব্যবহার। এতে বিনষ্ট হচ্ছে চাষযোগ্য ভূমির সঞ্জীবনী শক্তি। রাসায়নিক শিল্পকারখানা থেকে প্রতিদিন নদী, হ্রদ, জলাশয় ও সমুদ্রে মিশছে বিপুল পরিমাণ বিষাক্ত বর্জ্যপদার্থ। শিল্পকারখানার বর্জ্য, গাড়ির বিষাক্ত ধোঁয়া বাতাসের সঙ্গে মিশে সৃষ্টি করছে বায়ুদূষণ। মানুষ তার গৃহনির্মাণ, শিল্পকারখানার কাঁচামাল ও জ্বালানি কাঠের প্রয়োজনে প্রতিদিন উজাড় করছে বনভূমি। এতে বাতাসে অক্সিজেন কমছে। বাড়ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড। ফলে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পরিবেশ দূষণের প্রতিকার: পরিবেশ দূষণের প্রতিকার মারাত্মক। বায়ু ও পানিদূষণের ফলে মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের রোগ ও আত্মিক রোগ বাড়ছে। তাপমাত্রা ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে বহু এলাকায় মানব বসতির জন্য ভূমিকির সৃষ্টি হচ্ছে।

পরিবেশ দূষণরোধে পদক্ষেপ: পরিবেশ দূষণের ভয়াবহতা সম্পর্কে গণমাধ্যমে প্রচার করতে হবে এবং জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। বনভূমি ধ্বংস কঠোরভাবে বন্ধ করতে হবে। দেশের মোট আয়তনের ন্যূনতম ২৫% এলাকায় বনায়ন করতে হবে। জীবাশ্ম জ্বালানির পরিবর্তে বাতাস, সৌর ও জলবিদ্যুতের মতো পুনর্ব্যবহারযোগ্য জ্বালানির প্রচলন করতে হবে। কৃষিতে রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমিয়ে জৈবসারের ব্যবহার বাড়াতে হবে। কীটনাশকের ব্যবহার কমাতে হবে এবং পরিবেশবান্ধব কৃষি ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে হবে। এছাড়াও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার রোধ ও শিক্ষার হার বাড়াতে হবে।

উপসংহার: পরিবেশ সংরক্ষণের দায়িত্ব কেবল সরকার বা কোনো সংস্থা বা ব্যক্তিবিশেষের নয়, এ দায়িত্ব প্রতিটি সচেতন নাগরিকের। তাই পরিবেশ দূষণের বিপদ সম্পর্কে প্রতিটি মানুষকে সচেতন করে তুলতে হবে।

৪৪. বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ

বা/ প্রাকৃতিক দুর্যোগ

[পেরদুর সদর ২০২৬]

সংকেত: ভূমিকা; প্রাকৃতিক দুর্যোগের ধরন; ঘূর্ণিঝড়; কালবৈশাখি; বন্যা; নদীভাঙন; ভূমিধস; ভূমিকম্প; বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রতিকার; উপসংহার।

ভূমিকা: প্রকৃতি যখন ভয়ানক রূপ ধারণ করে মানুষের জীবন ও সম্পদের ক্ষতি করে তখন তাকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলে। প্রতিবছর বাংলাদেশে নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ নেমে আসে। এসব দুর্যোগে প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতিও হয় ব্যাপক। প্রাকৃতিক দুর্যোগে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দোলাচলে পড়ে অসহায় মানুষ।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের ধরন: বাংলাদেশে নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হয়ে থাকে। এগুলো হলো— কালবৈশাখি ঝড়, ঘূর্ণিঝড়, খর, অতিবৃষ্টি, বন্যা, ভূমিধস, পানিদূষণ, ভূমিকম্প, ঝড়, নদীভাঙন ইত্যাদি।

ঘূর্ণিঝড়: প্রতিবছরই এপ্রিল-মে এবং অক্টোবর-নভেম্বরে বাংলাদেশে ছোটো-বড়ো ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। প্রবল শক্তিসম্পন্ন এ ঝড়ে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়। ২০০৭ সালে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে আঘাত হানে প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন ঘূর্ণিঝড় 'সিডর'।

কালবৈশাখি: কালবৈশাখি সাধারণত এপ্রিল-মে মাসে বাংলাদেশের উপর দিয়ে বয়ে যায়। এর গতিবেগ সাধারণত চল্লিশ থেকে ষাট কিলোমিটার হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে এ ঝড়ের সঙ্গে শিলাবৃষ্টি হয়।

বন্যা: বাংলাদেশের এক বিস্তীর্ণ ভূভাগ প্রতিবছর বন্যায় প্রাণিত হয়। বন্যায় প্রাণহানি কম হলেও সম্পদ ও ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। বন্যা পরবর্তী সময়ে খাদ্যাভাব এবং নানারকম রোগ-ব্যাধি দেখা দেয়।

নদীভাঙন: বাংলাদেশে প্রতিবছর নদীভাঙনের ফলে বসতভিটা, ফসলি জমি নদীর বুকে বিলীন হয়ে যায়। লক্ষ লক্ষ লোক এর কবলে পড়ে সহায়সম্মলহীন হয়ে গ্রাম থেকে শহরে আশ্রয় নেয়।

ভূমিকম্প: বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি প্রভৃতি পাহাড়ি অঞ্চলে বর্ষা মৌসুমে মাঝে মাঝে পাহাড় ধসে পড়ে। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে গড়ে ওঠা অনেক ঘরবাড়ি চাপা পড়ে ঘটে প্রাণহানি।

ভূমিকম্প: ভূমিকম্প একটি ভয়াবহ ও মারাত্মক প্রাকৃতিক বিপর্যয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশ ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল। প্রায় প্রতিবছর বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এক বা একাধিক মৃদু ভূমিকম্প অনুভূত হয়।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রতিকার: প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পূর্ণভাবেই প্রকৃতিসৃষ্ট হওয়ায় পুরোপুরি এ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব নয়। তবে গণসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে এবং পরিকল্পিতভাবে দুর্যোগ মোকাবিলা করে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমানো যায়।

উপসংহার: ভূপ্রাকৃতিক বিন্যাস অনুযায়ী বাংলাদেশ একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চল। তাই সব ধরনের দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য সরকারি ও বেসরকারিভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

৪৫. ভূমিকম্প

সংকেত: ভূমিকা; ভূমিকম্প হওয়ার কারণ; বাংলাদেশ ও ভূমিকম্প; সচেতনতা ও করণীয়; উপসংহার।

ভূমিকা: ভূমিকম্প একটি ভয়াবহ ও মারাত্মক প্রাকৃতিক দুর্যোগ। হঠাৎ করে পৃথিবীর কোনো অংশ যখন কয়েক সেকেন্ডের জন্য কেঁপে ওঠে, তখন তাকে ভূমিকম্প বলা হয়। এটি খুব অল্পসময় স্থায়ী হলেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করতে পারে।

ভূমিকম্প হওয়ার কারণ: ভূমিকম্প প্রধানত মাটির গভীরে বা ভূ-অভ্যন্তরে ঘটা পরিবর্তনের কারণে হয়। মাটির নিচে থাকা বড়ো বড়ো শিলাখণ্ড বা প্লেট যখন নড়াচড়া করে অথবা একে অপরের সাথে ধাক্কা খায়, তখন এই কম্পন সৃষ্টি হয়। এছাড়া আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের ফলেও মাঝে মাঝে ভূমিকম্প হতে পারে।

বাংলাদেশ ও ভূমিকম্প: বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশ একটি ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকায় অবস্থিত। ১৮৯৭ সালে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও আসাম এলাকায় ৮.৭ মাত্রার একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প হয়েছিল যাতে হাজার হাজার মানুষ মারা গিয়েছিল। বর্তমানে প্রায় প্রতিবছর বাংলাদেশে ছোটো বা মাঝারি ধরনের ভূমিকম্প অনুভূত হয়।

সচেতনতা ও করণীয়: ভূমিকম্প পুরোপুরি বন্ধ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, তবে সচেতনতা ও পরিকল্পনার মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতি কমানো যায়। ভূমিকম্পের সময় আতঙ্কিত না হয়ে দ্রুত নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিতে হবে। দুর্যোগের পর উদ্ধার কাজ চালানোর জন্য দক্ষ লোকবল ও আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা আগে থেকেই রাখা প্রয়োজন।

উপসংহার: প্রাকৃতিক দুর্যোগের ওপর মানুষের হাত নেই, কিন্তু সঠিক প্রস্তুতি থাকলে আমরা বড়ো বিপদ থেকে রক্ষা পেতে পারি। তাই ভূমিকম্পের ঝুঁকি কমাতে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে পরিকল্পিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি।

খাদ্য ও পুষ্টি

৪৬. ধান (জি.পি.সি. ৭, ১৮, ১৮/১)

সংকেত: সূচনা; প্রকারভেদ ও বর্ণনা; চাষের প্রক্রিয়া; প্রয়োজনীয়তা; উপসংহার।

সূচনা: কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে ধান অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফসল। এটি আমাদের প্রধান খাদ্যশস্য। ধান তৃণজাতীয় উদ্ভিদ। ধানগাছ সাধারণত দুই থেকে তিন হাত পর্যন্ত লম্বা হয়। গাছের পাতা চিকন ও দীর্ঘ হয়। কাঁচা ধানগাছ সবুজ হয়ে থাকে। গাছ বড়ো হলে এর অগ্রভাগে শিষ বের হয়। পাকা ধানের রং সোনালি হয়ে থাকে।

প্রকারভেদ ও বর্ণনা: আমাদের দেশে সাধারণত চার প্রকার ধান হয়। যথা: আউশ, আমন, বোরো ও ইরি। আমাদের দেশে মাঠে মাঠে ধান চাষ করা হয়। হাওড়, খাল, বিল এবং নদীর চরেও ধানের চাষ হয়। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই ধান জন্মায়। তবে এশিয়া মহাদেশ, বিশেষ করে ভারত, পাকিস্তান, মিয়ানমার, শ্রীলঙ্কা, চীন, জাপান, থাইল্যান্ড ধানের জন্য বিখ্যাত।

চাষের প্রক্রিয়া: বাংলাদেশের মাটি ও আবহাওয়া ধান চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। ধান জমিতে রোপণের আগে এর বীজতলা তৈরি করা হয়। পরে উপযুক্ত সময়ে তা মাঠে সারিবদ্ধভাবে লাগানো হয়। পলি মাটি ও দোআঁশ মাটি ধান চাষের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে আউশ, অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে আমন আর বৈশাখ মাসে বোরো ধান কাটা হয়। ইরি ধানের চাষ বিভিন্ন সময়ে হয়ে থাকে। নিয়মিত সার, পানিসেচ ও পরিচর্যা পর পরিপক্ব ধান কাটা হয়।

প্রয়োজনীয়তা: ধান থেকে চাল হয়। চাল দিয়ে ভাত রান্না করা হয় যা আমাদের প্রধান খাবার। এছাড়া চাল থেকে চিড়া, মুড়ি ইত্যাদি খাবার তৈরি হয়। ধানের খড় গবাদিপশুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ধানের তুষ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

উপসংহার: আমাদের দেশে খাদ্যের চাহিদা পূরণে ধানের উৎপাদন বাড়ানো প্রয়োজন। আর এজন্য দরকার উন্নতমানের বীজ, সার, সেচব্যবস্থা এবং সরকারের সহযোগিতা।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

৪৭. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

সংকেত: ভূমিকা; কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কীভাবে কাজ করে; বাংলাদেশে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার; চিকিৎসাক্ষেত্রে; শিক্ষাক্ষেত্রে; অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে; কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সুবিধা; কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অসুবিধা; উপসংহার।

ভূমিকা: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এমন একটি প্রযুক্তি, যেখানে যন্ত্র বা কম্পিউটার মানুষের মতো চিন্তা করতে এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারে। মানুষের কাজকে সহজ ও দ্রুত করার জন্য এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। আজকের পৃথিবীতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চিকিৎসা, শিক্ষা, পরিবহন, ব্যাবসা, বিনোদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কীভাবে কাজ করে: এই প্রযুক্তিতে কম্পিউটারকে নানা ধরনের তথ্য দেওয়া হয়। এরপর বিশেষ কিছু নিয়ম বা প্রোগ্রাম (অ্যালগরিদম) দিয়ে যন্ত্রকে শেখানো হয় কীভাবে তথ্য বিশ্লেষণ করতে হয়। তারপর যন্ত্র নিজেই সেই তথ্য থেকে সিদ্ধান্ত নেয় বা নতুন কিছু তৈরি করে।

বাংলাদেশে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার: বর্তমানে বাংলাদেশে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার বাড়ছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, অর্থনীতি ও প্রশাসনে এই প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো হচ্ছে।

চিকিৎসাক্ষেত্রে: রোগীর তথ্য বিশ্লেষণ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ডাক্তারকে সাহায্য করে সঠিক চিকিৎসা দিতে। এমনকি কিছু রোবটিক সার্জারি বা অপারেশনও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে করা হয়, যা খুব নিখুঁত ও দ্রুত হয়।

১২৬ পাঞ্জেরী প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা সহায়িকা। পরীক্ষা ২০২৬

শিক্ষাক্ষেত্রে: শিক্ষাক্ষেত্রেও এই প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এখন শিক্ষার্থীর অগ্রগতি বুঝতে পারে এবং কোন বিষয়ে দুর্বল বা শক্তিশালী তা নির্ধারণ করে এবং সেই অনুযায়ী পড়ার পরামর্শ দেয়।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে: অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বড়ো ভূমিকা রাখছে। ব্যবসাব্যবসায় এটি তথ্য বিশ্লেষণ করে বাজারের অবস্থা জানায়। বাংলাদেশের বিভিন্ন ব্যাংকে এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক চ্যাটবট ব্যবহার করা হচ্ছে, যা গ্রাহকদের প্রশ্নের উত্তর দেয় ও প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সুবিধা: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার আবির্ভাবকে অনেকেই মানবজাতির জন্য একটি বিশাল আশীর্বাদ হিসেবে দেখেন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানুষের তুলনায় দ্রুত ও নিতুলভাবে কাজ করতে পারে। দ্রুত জটিল কোনো বিষয় বিশ্লেষণ করে সঠিক সমাধান দিতে পারে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অসুবিধা: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার আবির্ভাবকে কেউ কেউ এর নেতিবাচক দিক নিয়ে উদ্বেগ। কারণ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানুষের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়। মানুষ ভুল তথ্য দিলে সিদ্ধান্ত ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

উপসংহার: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আধুনিক যুগের এক অসাধারণ সৃষ্টি। এটি মানুষের জীবনে নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। তবে এর ব্যবহার যেন মানুষের কল্যাণে হয়, সেদিকে সবাইকে খেয়াল রাখতে হবে।

৪৮. আধুনিক জীবনে বিজ্ঞান

সংকেত: ভূমিকা; প্রকৃতির উপর আধিপত্য; দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান; চিকিৎসাক্ষেত্রে বিজ্ঞান; কৃষিক্ষেত্রে বিজ্ঞান; সংবাদপত্র; বিদ্যুৎ শক্তি আবিষ্কার; উপসংহার।

ভূমিকা: সভ্য মানুষের প্রতিদিনের জীবনে বিজ্ঞানের দান অপরিমিত। বিজ্ঞান আজ মানুষের নিত্যসঙ্গী। বিজ্ঞান ছাড়া মানুষ এক পা-ও চলতে পারে না। বিজ্ঞান আমাদের জীবনকে নিরাপদ করেছে, আমাদের জীবনকে সহজ করেছে।

প্রকৃতির উপর আধিপত্য: সভ্যতার প্রথম অবস্থায় মানুষ ছিল একান্ত অসহায়। প্রকৃতির নানা প্রতিকূলতার সঙ্গে মানুষ সর্বদা সংগ্রাম করে চলেছে। বনজঙ্গলে, জলে-স্থলে মানুষের সারাক্ষণ সংগ্রাম। সেই সংগ্রামে শেষ পর্যন্ত মানুষই জয়ী হলো।

দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান: দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে স্বাস্থ্য ও আরাম-আয়েশ। রেডিয়ো, টেলিভিশন, বৈদ্যুতিক বাতি ও কম্পিউটার ইত্যাদি যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের ফলে আমাদের জীবনযাত্রা অত্যন্ত সহজতর ও আরামদায়ক হয়েছে।

চিকিৎসাক্ষেত্রে বিজ্ঞান: চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাহায্যে আজ মানুষ অকাল মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। কলেরা, বসন্ত, ফন্সা ইত্যাদি ব্যাধিতে মানুষকে আর অসময়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হয় না। উন্নতমানের ওষুধ, অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা, এক্স-রে, অপারেশন যন্ত্র ইত্যাদি আবিষ্কারের ফলে চিকিৎসা বিজ্ঞানে এসেছে আমূল পরিবর্তন।

কৃষিক্ষেত্রে বিজ্ঞান: আধুনিক বিজ্ঞান কৃষিক্ষেত্রেও অশেষ কল্যাণ সাধন করে আসছে। প্রাচীন যন্ত্রপাতি লাঙল-জোয়ালের পরিবর্তে আজ ব্যবহৃত হচ্ছে উন্নতমানের লাঙল ও ট্রাক্টর। পচা আবর্জনা, গোবর সারের পরিবর্তে ব্যবহৃত হচ্ছে আধুনিক রাসায়নিক সার। গবেষণাগারের মাধ্যমে উন্নতমানের বীজ সরবরাহ করা হচ্ছে।

সংবাদপত্র: যে দৈনিক সংবাদপত্র সকালেই আমাদের সামনে বিশ্বের সংবাদ বহন করে এনে দেয়, তা বিজ্ঞানের দান। মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কার না হলে আজ তা সম্ভব হতো না। মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের ফলে লক্ষ লক্ষ গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে বিদ্যা ও জ্ঞান বিস্তারে সহায়তা করেছে।

বিদ্যুৎ শক্তি আবিষ্কার: বিদ্যুৎ শক্তি আবিষ্কার করে বিজ্ঞান মানুষের সুখ-স্বাস্থ্যকে বৃদ্ধি করেছে। দূরদূরান্তে বাতায়নের অস্বাভাবিক সুযোগ করে দিয়েছে। বৈদ্যুতিক আলো, বৈদ্যুতিক পাখা, রেডিয়ো, টেলিভিশন, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন আমাদের জীবনযাত্রাকে সুন্দর ও সহজ করেছে।

উপসংহার: আধুনিক সভ্যতা বিজ্ঞানের অপূর্ব সৃষ্টি। আজ আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সর্বত্রই জড়িয়ে আছে বিজ্ঞানের আশীর্বাদ। বিজ্ঞান পরম বন্ধুর মতোই আমাদের সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করে আমাদের জীবনকে সুখ-স্বাস্থ্যে ভরিয়ে দিয়েছে।

৪৯. কম্পিউটার /জি.পি.সি. পৃ. ১৯, ১৮, ১৭, ১৫, ১৪/

সংকেত: ভূমিকা; বর্ণনা; কম্পিউটারের প্রকারভেদ ও বিভিন্ন অংশ; কম্পিউটারের ব্যবহার; শিক্ষাক্ষেত্রে কম্পিউটারের অবদান; উপকারিতা; উপসংহার।

ভূমিকা: আধুনিক সভ্যতার শ্রেষ্ঠ প্রযুক্তি হিসেবে খ্যাত কম্পিউটার বর্তমানে মানবজীবনের সঙ্গে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত। কম্পিউটার শুধু গণনাই করে না, এটি বর্তমানে মানবজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখছে। কম্পিউটার যেন নবযুগের সূচনা করেছে।

বর্ণনা: ইংরেজি 'Computer' শব্দের বাংলা অর্থ 'গণকযন্ত্র'। এটি একটি যান্ত্রিক তথ্য সংগ্রহ ব্যবস্থা, যা নির্দেশ গ্রহণ ও সংরক্ষণ করে এবং জটিল সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে। কম্পিউটারের জনক বলা হয় চার্লস ব্যাবেজকে। ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত কম্পিউটার তৈরির ক্ষেত্রে ধাপে ধাপে এগিয়ে চলে।

কম্পিউটারের প্রকারভেদ ও বিভিন্ন অংশ: কাজের ধরন অনুসারে কম্পিউটারের বিভিন্ন প্রকারভেদ রয়েছে। যেমন: বড়ো ধরনের কম্পিউটার, মাঝারি ধরনের কম্পিউটার ও ছোটো কম্পিউটার। কম্পিউটারের প্রধান দুইটি অংশ থাকে— ১. হার্ডওয়্যার ও ২. সফটওয়্যার। কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারকে আবার তিনটি অংশে ভাগ করা যায়। যথা: ১. ইনপুট ইউনিট, ২. সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট ও ৩. আউটপুট ইউনিট।

কম্পিউটারের ব্যবহার: আধুনিক সভ্যতায় প্রতিটি কাজে এখন কম্পিউটার একটি নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা নিরীক্ষার নিখুঁত ফলাফলের জন্য বর্তমানে কম্পিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে কম্পিউটারের অবদান: শিক্ষাক্ষেত্রে কম্পিউটারের অবদান অপরিমিত। পরীক্ষার ফল প্রকাশ, বহুনির্বাচনী প্রশ্নের দ্রুত সমাধান, অঙ্কসময়ে বড়ো বড়ো হিসাব করাসহ নানাবিধ সুবিধা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে আধুনিক করে তুলেছে।

উপকারিতা: কম্পিউটার বিজ্ঞানের আধুনিক জগৎকে নানাভাবে সাহায্য করছে। খবরাখবর লেনদেনের মাধ্যম হিসেবেও কম্পিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে। ছোটেল, পরিবহনসহ বিভিন্ন সেটরে কম্পিউটারের ব্যবহার অনেক কাজকে সহজ করে দিয়েছে।

উপসংহার: কম্পিউটার আধুনিক যুগের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। কম্পিউটার আবিষ্কার মানবজাতির কাছে এক নতুন দিক খুলে দিয়েছে। কম্পিউটার ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কম্পিউটার মানুষের মেধা ও কায়িক শ্রমকে অনেকাংশে লাঘব করেছে।

৫০. মোবাইল ফোন /জি.পি.সি. পৃ. ১৯/

সংকেত: সূচনা; মোবাইল ফোনের বর্ণনা; মোবাইল ফোনের সুফল; মোবাইল ফোনের কুফল; উপসংহার।

সূচনা: আধুনিক বিজ্ঞানের এক বিস্ময়কর আবিষ্কার মোবাইল ফোন। মানুষের সুখ-স্বাস্থ্যের একটি নতুন দিক মোবাইল ফোন। এটি টেলিফোনের উন্নত সংস্করণ। বর্তমানে মোবাইল ফোন মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

মোবাইল ফোনের বর্ণনা: ১৯০০ সালে বিজ্ঞানী গ্রাহামবেল সর্বপ্রথম দূরে অবস্থিত মানুষের কথাবার্তা টেলিফোনের মাধ্যমে আদানপ্রদানে সক্ষম হন। এটির আরও সহজ ব্যবহারের প্রচেষ্টা থেকে আবিষ্কৃত হয় মোবাইল ফোন। বাংলাদেশে প্রথম মোবাইল ফোনের ব্যবহার শুরু হয় ১৯৯৩ সালে। বর্তমানে বাংলাদেশে পাঁচটি মোবাইল কোম্পানি রয়েছে। এগুলো হলো— টেলিটক, গ্রামীণফোন, বাংলালিংক, রবি ও এয়ারটেল।

মোবাইল ফোনের সুফল: পুরো বিশ্ব হাতের মুঠোয় বন্দি করে দিয়েছে মোবাইল ফোন। কান পাতলে মুহূর্তেই বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে নিরবচ্ছিন্নভাবে ভাবের আদানপ্রদান করা যায়। তারবিহীন ও সহজেই বহন করা যায় বলে এটির জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বী। বিপদাপদে, আনন্দ-বেদনায় জ্বর প্রয়োজনে মোবাইল এখন প্রতিটি মানুষের নিত্যসঙ্গী। তাৎক্ষণিক যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে মোবাইলের বিকল্প এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। মোবাইলে শুধু কথাই হয় না, এসএমএস-এর মাধ্যমে কাক্সিত সংবাদ মুহূর্তেই পৌঁছে দিতে পারে। এছাড়াও গেমস, ছবি তোলা, ছবি দেখা, গান শোনা, ভিডিও দেখা ও ভিডিও কল করা যায় স্মার্টফোনের মাধ্যমে। তাই মোবাইল ফোনের ব্যবহার সত্যিই বিস্ময়কর।

মোবাইল ফোনের কুফল: অসং লোকেরা চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই প্রভৃতি অসামাজিক কার্যকলাপে মোবাইল ফোন ব্যবহার করে। মোবাইল ফোনের কারণে স্কুল-কলেজের অনেক শিক্ষার্থীর পড়ালেখায় অনেক ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। এছাড়া মোবাইল ফোনের রেডিয়েশন মানবদেহের ক্ষতি সাধন করে থাকে।

উপসংহার: আসলে মোবাইল ফোনের কিছু ক্ষতিকর দিক থাকলেও এর উপকারের দিকই বেশি। বিশেষত যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়নে এর রয়েছে যুগান্তকারী ভূমিকা।

বই পড়া

৫১. প্রিয় বই /অ.পি.স.প. ১৯/

সংকেত: সূচনা; আমার প্রিয় বই; প্রিয় হওয়ার কারণ; শিক্ষণীয় বিষয়; উপসংহার।

সূচনা: বই হলো মানুষের সবচেয়ে ভালো বন্ধু। অবসর সময়ে একটি ভালো বই বন্ধুর মতোই আমাদের পাশে থেকে সঙ্গ দেয়। কিছু কিছু বইয়ে এমন সব গুণ থাকে পাঠকের হৃদয়ে দোলা দেয়। আর সে ধরনের বই হয় পাঠকের কাছে সবচেয়ে প্রিয়। সেই বই বারবার পড়েও যেন সাধ মেটে না।

আমার প্রিয় বই: আমি নানা ধরনের বই পড়তে ভালোবাসি। তবে রোমাঞ্চকর বই পড়তেই আমার সবচেয়ে ভালো লাগে। আমার পড়া সবচেয়ে প্রিয় বই হলো 'চাঁদের পাহাড়'। বইটির লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এটি মূলত রোমাঞ্চকর কিশোর উপন্যাস।

প্রিয় হওয়ার কারণ: রোমাঞ্চকর কাহিনি আমার সবসময় ভালো লাগে। অর 'চাঁদের পাহাড়' উপন্যাসের কাহিনি এক বাঙালি অভিযাত্রীর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এর নায়ক শঙ্কর রায় চৌধুরী রোমাঞ্চের খোঁজে তার গ্রামের এক অধিবাসীর সহায়তায় আফ্রিকার দুর্গম স্থানে যায়। সেখানে মানুষকে সিল্কের সজো তার যুদ্ধ হয়। তারপর আফ্রিকার বিস্তৃত সাপ দ্বারা তার উপর আক্রমণ করে। এখানেই সে পর্তুগিজ অভিযাত্রী ভিয়েগো আলভারেসের দেখা পায়। তার কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো হীরার বনির সম্পদ পায়। তারা হীরার বনির সম্পদে বের হয়। পথে তাদের জলন্ত আগ্নেয়গিরি থেকে শব্দ করে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। ভয়ংকর জন্তু বৃনিপ তার বন্ধু আলভারেসকে মেরে ফেলে। সে মনের অজান্তেই হীরার গুহা খুঁজে পায়। গুহায় পথ হারিয়ে অনেক কষ্টে সে বের হয়। সে সজো করে কিছু পাথর নিয়ে আসে। আসলে সে পাথর ছিল কাঁচা হীরা। এভাবে পুরো উপন্যাসটিই নানা রোমাঞ্চকর ঘটনায় পরিপূর্ণ। এই অসাধারণ বইটি একবার পড়া শব্দ করলে শেষ না করে ওঠা যায় না। আর এ কারণেই বইটি আমার প্রিয়।

শিক্ষণীয় বিষয়: 'চাঁদের পাহাড়' বইটিতে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। বইটি পড়ে আমার নতুন কিছু জ্ঞানার, নতুন কিছু করার আগ্রহ জন্মেছে। অজানাকে দেখার কৌতুহল সৃষ্টি হয়েছে বইটি পড়ে। এছাড়া আফ্রিকার অজানা অনেক তথ্য সম্পর্কে জানতে পেরেছি।

উপসংহার: আমার এই ছোটো জীবনে আমি বেশকিছু বই পড়ে ফেলেছি। তবে 'চাঁদের পাহাড়' বইটির মতো আর কোনো বইকে এত আপন বলে মনে হয়নি। সারা জীবন বইটি আমার পড়া বইগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় একটি বই হয়ে থাকবে।

খেলাধুলা

৫২. বাংলাদেশের জাতীয় খেলা

৮/ একটি গ্রাম্য খেলা: হাড্ডু

সংকেত: সূচনা; খেলার মাঠ; খেলার বর্ণনা; উপকারিতা; অপকারিতা; উপসংহার।

সূচনা: বাংলাদেশে যে সমস্ত ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলা রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হাড্ডু। হাড্ডু বা কাবাডি আমাদের দেশের জাতীয় খেলা।

খেলার মাঠ: খেলামেলা জায়গা হাড্ডু খেলার জন্য উত্তম স্থান। নরম মাটিতে দাগ কেটে সীমানা বা কেট নির্ধারণ করা হয়। কোর্টের মাঝামাঝি একটা রেখা টেনে তাকে সমান দুটো ভাগে ভাগ করা হয়।

খেলার বর্ণনা: হাড্ডু খেলা দুই দলে খেলতে হয়। প্রত্যেক দলে ১১ জন বা তার কম বা বেশি খেলোয়াড় থাকে। খেলার মাঠের মাঝখান থেকে এক দলের একজন খেলোয়াড় লম্বা ঝাস নিয়ে অন্য দলের সীমানায় ঢুকে পড়ে। যতক্ষণ তার ঝাস থাকে ততক্ষণ হাড্ডু অথবা কাবাডি ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করতে থাকে। এ সময় বিপক্ষ দলের কেউ তাকে ছুঁলে সে মৃত হয়ে যায়। ওই খেলোয়াড়ও প্রাণপণ চেষ্টা চালায় বিপক্ষ দলের এক বা একাধিক খেলোয়াড়কে ছুঁয়ে দিয়ে আপন সীমার মধ্যে ফিরে আসতে। বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়রাও ওত পেতে থাকে কীভাবে তাকে তাদের নিজেদের সীমানার মধ্যে আটকে দেওয়া যায়। যদি আটকিয়ে রাখা সময়ের মধ্যেই আক্রমণকারী খেলোয়াড়ের নিঃশ্বাস ফুরিয়ে যায় তা হলে সে 'মৃত' ঘোষিত হয়।

উপকারিতা: হাড্ডু খেলা দেহ-মনের জন্য অত্যন্ত উপকারী। ঝাস বন্ধ করে খেলতে হয় বলে এতে ফুসফুসের যথেষ্ট ব্যায়াম হয়। এ খেলায় শরীর মজবুত ও বলিষ্ঠ হয়।

অপকারিতা: খেলতে গিয়ে শরীরের কোনো অংশ ভেঙে গেলে চিরদিনের জন্য হয়তো খেলোয়াড় পজা হয়ে যায়। তাই এ খেলা খেলার সময় সাবধানতা অবলম্বন করা জরুরি।

উপসংহার: হাড্ডু খেলা বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক সমাদৃত। গ্রামাঞ্চলে বিশেষ করে বর্ষাকালে হাড্ডু খেলার আয়োজন করা হয়।

৫৩. ফুটবল

৮/ প্রিয় খেলা /অ.পি.স.প. ১৯, ১৮, ১৭, ১৬/

সংকেত: ভূমিকা; ফুটবল খেলার ইতিহাস; খেলার নিয়মকানুন; প্রয়োজনীয়তা; উপসংহার।

ভূমিকা: ফুটবল পৃথিবীর অন্যতম একটি প্রাচীন ও জনপ্রিয় খেলা। এ খেলা শুরুর থেকে শেষ পর্যন্ত উত্তেজনায় ভরা। ফুটবল খেলার প্রতি আমার রয়েছে প্রচণ্ড আকর্ষণ। তাই ফুটবলই আমার সবচেয়ে প্রিয় খেলা।

ফুটবল খেলার ইতিহাস: ফুটবল কখন, কোথায় চালু হয় তার ইতিহাস স্পষ্ট করে বলা যায় না। ধারণা করা হয়, রোমানরাই সর্বপ্রথম ইউরোপে ফুটবলের প্রচলন ঘটায়। তবে আধুনিক ফুটবলের প্রবর্তন ঘটে ইংল্যান্ডে। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশেই ফুটবল খেলা হয়ে থাকে। ফুটবল খেলার জন্য প্রথমত প্রয়োজন সমতল একটি মাঠ এবং গোলাকার একটি বল। মাঠটি আয়তাকার হওয়া থাকে। খেলোয়াড়রা দুইটি দলে বিভক্ত হয়ে মাঠে নামে। উভয় দলে ১১ জন করে খেলোয়াড় থাকে। মাঠের দুই প্রান্তে দুইটি গোলপোস্ট স্থাপন করা হয়। খেলা নিয়ন্ত্রণের জন্য একজন রেফারি থাকেন।

খেলার নিয়মকানুন: ফুটবল খেলার নিয়মকানুন বেশ সহজ। দুই দলের ২০ জন খেলোয়াড় বল নিজেদের দখলে রাখার চেষ্টা করে। দুইটি গোলপোস্ট রক্ষা করেন দুই দলের গোলরক্ষকদ্বয়। খেলার মাঠে রেফারির সিঁচরাই চূড়ান্ত। তাকে সাহায্য করার জন্য থাকেন দুইজন লাইনস্ম্যান। দুইটি ভাগে ৪৫ মিনিট করে মোট ৯০ মিনিট খেলা হয়। মাঝে মাঝে ১০ মিনিটের বিরতি। কেউ বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়কে অবৈধভাবে বাধা দিলে বা আঘাত করলে ফাউল হয়। এক দলের খেলোয়াড়রা বিপক্ষ দলের গোলপোস্টের ভিতর বল ঢোকাতে পারলে তা 'গোল' হিসেবে ধরা হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে দল গোলসংখ্যায় এগিয়ে থাকে তারাই জয়ী হয়।

প্রয়োজনীয়তা: ফুটবল খেলা অত্যন্ত আনন্দদায়ক ও উদ্ভেজনাপূর্ণ। স্বাস্থ্যের জন্য এ খেলা খুবই উপকারী। এতে শরীরের প্রতিটি অংশ চমৎকারভাবে সংযুক্ত হয়। ফলে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো দৃঢ় ও সবল হয়। তাছাড়া ফুটবল খেলায় কঠোর শৃঙ্খলা অনুসরণ করা হয়। তাই এ খেলার মধ্য দিয়ে নিয়মানুবর্তিতার অনুশীলন করাও সম্ভব হয়।

উপসংহার: ফুটবল খেলা চিত্তবিনোদনের একটি চমৎকার উপায়। শরীরকে সুস্থ রাখার পাশাপাশি এ খেলা মনকেও সুস্থ ও সতেজ রাখে। তাই বাংলাদেশে এ খেলার প্রসারে সবার আরও বেশি সচেষ্ট হওয়া অত্যন্ত জরুরি।

চরিত্র গঠন

৫৪. ছাত্রজীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য

সংকেত: সূচনা; ছাত্রজীবনের লক্ষ্য; লক্ষ্য অর্জনে করণীয়; ছাত্রজীবনে দায়িত্ব ও কর্তব্য; উপসংহার।

সূচনা: মানুষের জীবনে প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যা অর্জনের সময়টিই হলো ছাত্রজীবন। ছাত্রজীবন হলো জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময়। ছাত্রজীবনের সুশিক্ষাই ভবিষ্যৎ জীবনের পাথর। আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতিষ্ঠা ছাত্রজীবনের ভিত্তির উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল।

ছাত্রজীবনের লক্ষ্য: ছাত্রজীবনের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য অধ্যয়ন। ছাত্রজীবনে ছাত্রদের অন্যতম কাজ হলো শিক্ষাদীক্ষায় সমৃদ্ধ ও আদর্শ জীবন গঠন করা। বাজে কাজে সময় নষ্ট না করে প্রচুর পড়াশোনা করে জ্ঞানভান্ডার সমৃদ্ধ করা ছাত্রজীবনের অন্যতম কর্তব্য। ছাত্রজীবনেই জীবনের লক্ষ্য স্থির করতে হবে এবং সে অনুযায়ী প্রভুতি নিতে হবে। তা হল জীবন সার্থক হবে।

লক্ষ্য অর্জনে করণীয়: চরিত্র মানবজীবনের অমূল্য সম্পদ। তাই ছাত্রজীবনে চরিত্র গঠনে বিশেষ মনোযোগী হতে হবে। এক্ষেত্রে ছাত্রজীবনের মূল আদর্শ হলো উচিত সত্যতা। অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে শরীর গঠনের প্রতিও ছাত্রদের মনোযোগী হতে হবে। কেননা, স্বাস্থ্য মানবজীবনের অমূল্য সম্পদ।

ছাত্রজীবনে দায়িত্ব ও কর্তব্য: ছাত্ররাই দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ। তাই ছাত্রজীবনে জনসেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করা সকলের কর্তব্য। বন্যা, দুর্গত, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে আসা শিক্ষার্থীদের কর্তব্য।

উপসংহার: ছাত্ররাই দেশের ভবিষ্যৎ। ছাত্ররাই একদিন বড়ো হয়ে দেশকে অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। তাই সুশিক্ষা লাভ করে নিজের জীবনের এবং দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ গৌরবোজ্জ্বল করা প্রত্যেক ছাত্রেরই কর্তব্য।

৫৫. সময়ের মূল্য

সংকেত: সূচনা; সময়ের গুরুত্ব; সময়ের সদব্যবহার; ছাত্রজীবনে সময়ের মূল্য; মহৎ ব্যক্তিদের সময়নিষ্ঠা; উপসংহার।

সূচনা: সময় অতি মূল্যবান সম্পদ। সম্পদ হারালে কঠোর পরিশ্রম করে হারানো সম্পদ উদ্ধার করা যায়। কিন্তু যে সময় নষ্ট হয়ে গেছে তা আর শত চেষ্টাতেও ফিরে পাওয়া যায় না। তাই জীবনে উন্নতি করতে হলে প্রতিটি মুহূর্তকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে।

সময়ের গুরুত্ব: যে সময় একবার একবার চলে যায়, তা আর কখনো ফিরে আসে না। সংক্ষিপ্ত জীবন সার্থক করে তুলতে হলে সময়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে হবে। যে ব্যক্তি অলসতা ত্যাগ করতে পারে এবং সময়ের সদব্যবহার করতে পারে তার সাফল্য অনিবার্য।

সময়ের সদব্যবহার: বাল্যকাল থেকেই সময়ের সদব্যবহার করতে হয়। ছাত্রজীবনে প্রতিদিন নিয়ম করে লেখাপড়া, খেলাধুলা, আহার, বিশ্রামের মধ্য দিয়েই প্রশংসিত হওয়া যায়। যে ছাত্র নিয়মিত পড়াশোনা না করে হেলায় সময় নষ্ট করে তার পতন অনিবার্য। কর্মজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সময়ের সদব্যবহার করা উচিত।

ছাত্রজীবনে সময়ের মূল্য: ছাত্রজীবনে সময়ের সদব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। ছাত্রজীবনেই 'পড়ার সময় পড়া এবং খেলার সময় খেলা'-এ নিয়ম মেনে চলা উচিত। এতে পরবর্তী জীবনে সময়নিষ্ঠ হওয়া যায় এবং জীবনে উন্নতি করা যায়। কেননা ছাত্রজীবন পরবর্তী জীবনের প্রভুত্বকাল। সুতরাং এখন সময়ের সদব্যবহার করলে পরবর্তী জীবনে উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করা যায়।

মহৎ ব্যক্তিদের সময়নিষ্ঠা: পৃথিবীতে মহৎ ব্যক্তিগণ সময়নিষ্ঠ ছিলেন। সক্রেটিস, শেকসপিয়ার, নিউটন, ভলভেয়ার প্রমুখ দার্শনিকগণ সময়ের সদব্যবহার করে আজও অমর হয়ে আছেন।

উপসংহার: মানুষের জীবন দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে আসবে না। তাই মানুষের উচিত এ জীবনকে পরিপূর্ণ করে গড়ে তোলা। এজন্য সময়ানুবর্তিতা একান্ত প্রয়োজন। সময়ানুবর্তী জীবন উজ্জ্বল জীবনের উপমা।

৫৬. স্বদেশপ্রেম

সংকেত: ভূমিকা; স্বদেশপ্রেমের স্বরূপ; দেশপ্রেমের উপায়; মনীষীদের দেশপ্রেমের দৃষ্টান্ত; দেশপ্রেমের সুফল; উপসংহার।

ভূমিকা: নিজের দেশকে ভালোবাসাই স্বদেশপ্রেম। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে— মাতা, মাতৃভূমি ও মাতৃভাষা আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। স্বদেশের পরিচয়েই ব্যক্তি বা জাতির পরিচয়। তাই প্রত্যেকটি মানুষকেই দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়া উচিত। কবির ভাষায়—

স্বদেশের উপকারে নাই যার মন
কে বলে মানুষ তারে? পশু সেই জন।

স্বদেশপ্রেমের স্বরূপ: দেশকে ভালোবাসা মানে শুধু সে দেশের মাটিকে ভালোবাসা নয়। দেশপ্রেম হলো নিজের দেশকে ভালোবাসার মধ্যে যে আন্তরিকতা, স্বদেশবাসীর কল্যাণে কর্মপ্রেরণা ও নিষ্ঠা, তাতে আমৃত্যু অবিচল থাকা। কবিদের কণ্ঠে বারবার ধ্বনিত হয়েছে স্বদেশপ্রেমের বিচিত্র বৈশিষ্ট্য এবং দেশবাসীর প্রতি দেশের প্রতিটি মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যের ইঙ্গিত।

দেশপ্রেমের উপায়: দেশপ্রেম বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। দেশের স্বাধীনতা রক্ষা, শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতি বা অন্যান্য জাতীয় স্বার্থের ক্ষেত্রে কাজ করেও দেশপ্রেমের পরিচয় দেওয়া যায়। সালাম, জব্বার, রফিক, বরকত ভাষা আন্দোলনের জন্য অমর হয়ে আছেন।

মনীষীদের দেশপ্রেমের দৃষ্টান্ত: আমাদের প্রিয় নবি হজরত মুহম্মদ (স) বলেছেন, 'আপন দেশকে ভালোবাসা ইমানের অঙ্গ'। স্বদেশের জন্য আমাদের দেশের মানুষের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তিতুমীর, ফুজিরামসহ অনেকেই নিজস্ব জীবন উৎসর্গ করেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ত্রিশ লাখ মানুষের আত্মদান দেশপ্রেমের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

দেশপ্রেমের সুফল: স্বদেশপ্রেম মানুষকে বিশ্বপ্রেমিক হতে উদ্বুদ্ধ করে। যদি কোনো মানুষ নিজের দেশকে ভালোবাসে সে বিশ্বজগৎকে ভালোবাসে। স্বদেশপ্রেম একজন লোককে প্রকৃত দেশপ্রেমিক হওয়ার শিক্ষাদান করে। স্বদেশপ্রেমের শিক্ষা নিজের ঘরবাড়ি ও প্রতিবেশীকে ভালোবাসার মন্ত্র হতে শুরু হয়। স্বদেশপ্রেম আমাদেরকে সহানুভূতি ও বিশ্বভ্রাতৃত্বে উদ্বুদ্ধ করে।

উপসংহার: একজন খ্যাতি দেশপ্রেমিক জাতির পৌরব। তিনি জাতির অমূল্য সম্পদ। তাই দেশপ্রেমিক হতে প্রত্যেকের প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালানো উচিত।

৫৭. অধ্যবসায়

সংকেত: ভূমিকা; প্রয়োজনীয়তা; ছাত্রদের জন্য অধ্যবসায়; উপসংহার।

ভূমিকা: কোনো কাজে সাফল্য লাভের জন্য বারবার চেষ্টা করার নামই অধ্যবসায়। জীবনে সফল হওয়ার জন্য এই অধ্যবসায়ের খুবই প্রয়োজন। অধ্যবসায় ছাড়া কঠিন কোনো কাজে সফলতা লাভ করা যায় না।

প্রয়োজনীয়তা: জগতে কোনো কিছুই সহজে লাভ করা যায় না। কোনো কিছু লাভ করতে হলে তার জন্য কঠোর পরিশ্রম ও চেষ্টা করতে হয়। এ প্রসঙ্গে কবি বলেছেন—

কাঁটা হেরি ফাক্ত কেন কমল তুলিতে
দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহিতে?

অর্থাৎ ভালো কিছু পেতে হলে তার জন্য কষ্ট সহ্য করতে হয়। কিনা কষ্টে জগতে কিছুই পাওয়া যায় না। কোনো কিছু অর্জন করতে হলে সফলতার পাশাপাশি ব্যর্থতাও আসতে পারে। একবার ব্যর্থ হলেই তার জন্য হতাশ হওয়া ঠিক নয়। ব্যর্থতার পরও ক্রমাগত চেষ্টা করে গেলে অনেক কঠিন কাজেও সাফল্য লাভ করা সম্ভব হয়। জগতে এ ধরনের দৃষ্টান্তের কোনো অভাব নেই। স্কটল্যান্ডের রাজা রবার্ট ব্রুস বারবার যুদ্ধে পরাজিত হয়েও ক্রমাগত চেষ্টার দ্বারা শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হয়েছিলেন। মহানবি হজরত মুহাম্মদ (স) বারবার ব্যর্থ হওয়ার পরও অসীম ধৈর্য আর কঠিন অধ্যবসায়ের মাধ্যমে মক্কাবাসীকে ইসলামের আলেয় আলোকিত করতে পেরেছিলেন।

ছাত্রদের জন্য অধ্যবসায়: অধ্যবসায় ছাত্রদের একটি মহৎ গুণ। অলস ও শ্রমবিমুখ ছাত্র কখনোই পরীক্ষায় ভালো ফল লাভ করতে পারে না। ছাত্রজীবন ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতিকাল। এ সময়েই অধ্যবসায়ের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। এ প্রসঙ্গে কবি বলেছেন,

পাঁচ জনে পারে যাহা, তুমিও পারিবে তাহা
কেন পারিবে না তাহা ভাব একবার
একবার না পারিলে দেখ শতবার।

উপসংহার: অধ্যবসায়ী হলে আমরা সবাই জীবনে সফলতা লাভ করতে পারব। এ জগতে যারা বড়ো হয়েছেন, তাঁরা সকলেই অধ্যবসায়ী ছিলেন। তাই আমাদের সবাইকে অবশ্যই অধ্যবসায়ী হতে হবে।

৫৮. শ্রমের মর্যাদা

সংকেত: ভূমিকা; শ্রমের আবশ্যিকতা; শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কে ধারণা; মহাপুরুষদের জীবনে শ্রমের স্থান; শ্রমের সুফল; উপসংহার।

ভূমিকা: 'শ্রমের মর্যাদা' বলতে আমরা শারীরিক শ্রমের মর্যাদাই বুঝি। মানুষের পরিশ্রম দুই প্রকার— শারীরিক ও মানসিক। শরীর ছাড়া মনের অস্তিত্ব নেই। মন ছাড়া শরীর মূল্যহীন। তাই দেহের পরিশ্রম এবং মনের পরিশ্রমের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। উভয় প্রকার শ্রমকেই আমাদের মর্যাদা দিতে হবে।

শ্রমের আবশ্যিকতা: স্বাস্থ্য, ধন, মান ও মন সবকিছুই শ্রমের দ্বারা লাভ করতে হয়। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মানুষকে জীবিকার্জন করতে হয়। সুতরাং জীবনে ধন, মান, স্বাস্থ্য ও প্রতিপত্তি প্রভৃতি লাভ করে সুস্থ জীবনধারণের জন্যই শ্রমের আবশ্যিক। শ্রমবিমুখ ব্যক্তি অভিশপ্ত জীবনধারণ করে।

শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কে ধারণা: কায়িক শ্রমকে আমরা অমর্যাদাকর বলে মনে করি। শ্রমের কথা মনে উঠলেই আমরা তা সম্মানহানিকর বলে মনে করি। আসলে কোনো কায়িক শ্রমই অসম্মানজনক নয়। কায়িক শ্রমকে সমাজে নিন্দনীয় মনে করে আমরা অলস জাতিতে পরিণত হয়েছি।

মহাপুরুষদের জীবনে শ্রমের স্থান: মহাপুরুষেরা মানবজাতির আদর্শ। কর্ম ও চিন্তার দ্বারা তাঁরা আমাদের অশেষ মজল সাধন করেছেন। গ্রিক মনীষী অ্যারিস্টটল তাঁর বিদ্যালয় 'লাইসিয়াম'— জ্ঞানচর্চার পাশাপাশি কায়িক শ্রমের মাধ্যমে ছাত্রদের শিক্ষাদান করতেন। যিশুখ্রিস্ট ছিলেন কাঠমিস্ত্রির ছেলে। তাঁর শৈশব কেটেছে কঠোর শ্রমে। হজরত মুহাম্মদ (স) নিজেই শ্রমজীবী মানুষের দৃষ্টান্ত।

শ্রমের সুফল: কায়িক পরিশ্রম অপমানজনক নয়। পৃথিবীর সকল মহৎ ব্যক্তিই কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন। পরিশ্রমী ব্যক্তির দেহ ও মন সুস্থ থাকে। তার মন খারাপ চিন্তা থেকে মুক্ত থাকে। পরিশ্রমের ফলে পথের ডিখারিও রাজা হতে পারে আবার শ্রমবিমুখতায় লক্ষপতিও পথের ডিখারি হয়। দেশ ও জাতির অবনতির মূলে শ্রমবিমুখতা। মানবজাতির স্থিতি ও উন্নতির মূলেও রয়েছে শ্রমশক্তি।

উপসংহার: পরিশ্রম সৌভাগ্যের চাবিকাঠি। ভাগ্য পরিবর্তন করতে হলে প্রয়োজন পরিশ্রম। পরিশ্রম ছাড়া কোনো মানুষ বা জাতি বড়ো হতে পারে না। যারা শারীরিক পরিশ্রম করেন তাঁরা বুঝতে পেরেছেন যে, জগতের বিপুল সভ্যতা তাঁদেরই শ্রমের ফল। কাজেই আনন্দ, কাজেই সুখ। সুতরাং শ্রমের মর্যাদা আজ সুপ্রতিষ্ঠিত।

উৎসব

৫৯. বাংলাদেশের উৎসব /জ.ব.খ. ২০২০/

সংকেত: ভূমিকা; মুসলিমদের উৎসব; হিন্দুদের উৎসব; বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানদের উৎসব; ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের উৎসব; উপসংহার।

ভূমিকা: বাংলাদেশ একটি উৎসবমুখর দেশ। ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের কারণে এ দেশে সারা বছরই বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এ দেশের উৎসবগুলো পারস্পরিক সম্প্রীতির বহিঃপ্রকাশ। 'ধর্ম যার যার, উৎসব সবার'— এই নীতি অনুসরণ করে এ দেশের মানুষ যুগ যুগ ধরে একসঙ্গে বসবাস করছে।

মুসলিমদের উৎসব: বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রধান দুটি ধর্মীয় উৎসব হলো ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা। দীর্ঘ এক মাস রোজা রাখার পর অত্যন্ত আনন্দের সাথে ঈদুল ফিতর উদ্‌যাপিত হয়। আর ঈদুল আজহায় স্মৃতিকর্তার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পশু কোরবানি দেওয়া হয়। ঈদের দিন মানুষ নতুন পোশাক পরিধান করে, ঈদের নামাজ আদায় করে এবং পারস্পরিক কুশল বিনিময় করে।

হিন্দুদের উৎসব: হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব হলো দুর্গাপূজা। শরৎকালে এই উৎসব অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় দেশের বিভিন্ন স্থানে দশমী পূজা মণ্ডপ তৈরি করা হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ নতুন পোশাকে মণ্ডপগুলো পরিদর্শন করেন এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। এছাড়া লক্ষ্মীপূজা, সরস্বতী পূজা ও দীপাবলিও তাদের অন্যতম উৎসব।

বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানদের উৎসব: বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব 'বৌদ্ধ পূর্ণিমা'। এই দিনে তারা গৌতম বুদ্ধের জন্ম ও জ্ঞানলাভের স্মৃতি স্মরণ করে বিশ্ব শান্তির জন্য বিশেষ প্রার্থনা করেন। অন্যদিকে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের প্রধান উৎসব হলো 'বড়দিন'। প্রতিবছর ২৫শে ডিসেম্বর যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন উপলক্ষ্যে গির্জাগুলো সুন্দর করে সাজানো হয় এবং বিশেষ প্রার্থনা ও কেক কাটার মাধ্যমে দিনটি উদ্‌যাপিত হয়।

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের উৎসব: বাংলাদেশের পাছাড়ি অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের নিজস্ব কিছু ঐতিহ্যবাহী উৎসব রয়েছে। চাকমা সম্প্রদায়ের প্রধান উৎসব হলো 'বিজু'। এ উৎসবে তারা বাংলা নতুন বছরের আগমনকে স্বাগত জানায়। অন্যদিকে রাখাইন ও মারমা সম্প্রদায়ের প্রধান উৎসব হলো 'সাংগ্রাই'। বর্ষবরণের এই উৎসবের মূল আকর্ষণ 'জলকেলি'। ত্রিপুরার মানুষের বর্ষবরণের উৎসব হলো 'বৈসু'।

উপসংহার: বিভিন্ন ধর্ম ও জাতিসত্তার উৎসবগুলো বাংলাদেশের জাতীয় সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে। এসব ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ বৃদ্ধি করে। উৎসবের এই বৈচিত্র্যই বাংলাদেশের সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

৬০. বৈশাখী মেলা /জ.ব.খ.খ. ১৭, ১৬, ১৫/

সংকেত: ভূমিকা; মেলার স্থান; প্রাপ্ত দ্রব্যাদি; ভালো লাগার দিক; উপসংহার।

ভূমিকা: বাংলাদেশে সারা বছর নানারকম উৎসব-পার্বণ লেগে থাকে। বৈশাখী মেলা তেমনই একটি আনন্দমুখর উৎসব। বাংলা সনের প্রথম মাস বৈশাখে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। বৈশাখী মেলা উপলক্ষ্যে সব ধরনের মানুষ একত্রে মিলিত হয়, আনন্দে মেতে ওঠে।

মেলার স্থান: বৈশাখী মেলা মূলত আমাদের গ্রামীণ ঐতিহ্যের পরিচায়ক। প্রাচীনকাল থেকে এ দেশে সাধারণত গ্রামীণ পরিবেশে বৈশাখী মেলার প্রচলন লক্ষ করা যায়। গ্রামের খোলা মাঠে, নদীর তীরে, বড়ো কোনো গাছের নিচে কিংবা স্কুল-কলেজের মাঠে মেলা বসে। ইদানীং ঢাকা সহ দেশের ছোটো-বড়ো শহরগুলোতেও বৈশাখী মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

প্রাণ্ড দ্রব্যাদি: বৈশাখী মেলায় নানারকম লোকজ দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। বিচিত্র ধরনের খেলনা। যেমন: মাটির পুতুল, বাঁশি, নাটাই-ঘুড়ি ইত্যাদি শিশুদের আকর্ষণ করে। বিিন্ন ধানের খই, হরেক রকমের মিষ্টিসহ ঐতিহ্যবাহী অনেক খাবার এই মেলায় পাওয়া যায়। এছাড়া কুটির শিল্পে তৈরি নানা জিনিস যেমন: নীতলপাটি, নকশিকাঁথা, তালপাতার পাখাসহ নিত্যব্যবহার্য তৈজসপত্রও মেলায় পাওয়া যায়।

ভালো লাগার দিক: বৈশাখী মেলার প্রাক্কাণে সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের সমাগম ঘটে। এর মাধ্যমে আমাদের সামাজিক বন্ধন আরও দৃঢ় হয়। মেলা শিশুদের মনে আনন্দের দোলা দিয়ে যায়। পছন্দের খেলনা আর মুখরোচক নানা খাবারদাবার পেয়ে তাদের মন খুশিতে ভরে ওঠে। শহরে আয়োজিত বৈশাখী মেলায় গ্রামীণ জীবনের পরিচয় ফুটে ওঠে। ফলে শহরে বসেও আমরা গ্রামের উৎসবকে অনুভব করতে পারি। বৈশাখী মেলার মাধ্যমে এ দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হওয়া যায়।

উপসংহার: বৈশাখী মেলা এ দেশের গ্রামীণ ঐতিহ্যের ধারক। মেলা আমাদের কাছে নির্মল আনন্দের বার্তা নিয়ে আসে। মানুষের সঙ্গে মানুষের এক অপূর্ব মিলনক্ষেত্র এই বৈশাখী মেলা। তাই বৈশাখী মেলা আমাদের পর্ব, আমাদের অহংকার।

৬.১. ঈদ উৎসব

সংক্ভ: সূচনা; প্রকারভেদ; ঈদুল ফিতর; ঈদুল আজহা; ঈদ উৎসবের তাৎপর্য; উপসংহার।

সূচনা: 'ঈদ' আরবি শব্দ। এর অর্থ খুশি বা আনন্দ। ঈদ মুসলমানদের প্রধান উৎসব। এ সময় তাদের ঘরে ঘরে চলে খুশির ফোয়ারা।

প্রকারভেদ: মুসলমানরা বছরে দুইটি ঈদ উৎসব উদ্যাপন করে থাকেন। এ উৎসব দুটি হলো 'ঈদুল ফিতর' ও 'ঈদুল আজহা'।

ঈদুল ফিতর: 'ঈদুল ফিতর' কথাটি আরবি। দরিদ্রদের 'ফিতরা' সহায়তা দিতে হয় বলে এর নাম 'ঈদুল ফিতর'। সংহমের মাস পবিত্র রমজানের পর এ ঈদ হয়। মুসলমানেরা পুরো রমজান মাস রোজা রাখেন। এর পর শাওয়াল মাসের নতুন চাঁদ দেখা গেলে পরদিন 'ঈদুল ফিতর' উৎসব উদ্যাপিত হয়। একে রোজার ঈদও বলা হয়। ঈদের দিন সকালে মুসলমানরা নতুন পোশাক পরে ও আতর মেখে ঈদগাহে নামাজ পড়তে যান। নামাজের পর তারা পরস্পরের সঙ্গে প্রাণখুলে কোলাকুলি করেন। ছোটো-বড়ো, ধনী-গরিব ভেদাভেদ থাকে না। এদিন সবার বাড়িতে সাধ্যমতো পোলাও, মাংস, সেমাই ইত্যাদি ভালো খাবার তৈরি হয়।

ঈদুল আজহা: 'ঈদুল আজহা' শব্দটিও আরবি। এর অর্থ উৎসর্গের উৎসব। আব্রাহাম তায়াল তাঁর পরমপ্রিয় ভক্ত হজরত ইব্রাহীম (আ.) কে পরীক্ষা করার জন্য তাঁর প্রিয়বস্তু কোরবানি করার নির্দেশ দিলেন। অনেক চিন্তাভাবনার পর হজরত ইব্রাহীম (আ.) বুঝতে পারলেন, তাঁর সবচেয়ে প্রিয় হলো শিশুপুত্র ইসমাইল (আ.)। তিনি পুত্রকেই কোরবানি দিতে গেলেন। এতে আব্রাহাম তায়াল খুশি হলেন। ইসমাইলের বদলে একটি দুধা কোরবানি হয়ে গেল। সেই থেকে মুসলমানরা প্রতিবছর ঈদুল আজহার দিনে কোরবানি করেন।

ঈদ উৎসবের তাৎপর্য: ঈদ উৎসবের তাৎপর্য অশেষ। এ শুধু আনন্দের উপলক্ষ্য নয়, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও শৃঙ্খলা রক্ষার শিক্ষাও বটে।

উপসংহার: ঈদ মুসলমানদের জন্য সামাজিক মিলনের এক বড়ো উপলক্ষ্য। ছোটো-বড়ো, ধনী-গরিব আপন-পর সবাই ভেদাভেদ ভুলে এ দিন আনন্দে মেতে ওঠে।

সুপার সাজেশন

পরীক্ষার জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন— ১, ৯, ১৩, ১৬, ২৫, ২৭, ২৯, ৪১, ৪৮, ৫৮

নিজেকে যাচাই করি: রচনা লিখন

বৃত্তি পরীক্ষায় সাফল্য নিশ্চিত করতে হলে প্রতিটি প্রশ্নের ধরনে পূর্ণ নম্বর পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। প্রশ্নের ধরন ১৫-এ তোমার প্রকৃতি কেমন হলো তা যাচাইয়ের জন্য এখানে বিভিন্ন অধ্যায়ের সমন্বয়ে ১০ সেট প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। তুমি নিজে নিজে পরীক্ষা দিয়ে 'উত্তরমালা'র সঙ্গে মিলিয়ে দেখো। যদি সবগুলোর উত্তর সঠিক না হয় তাহলে পূর্বের অংশটি পুনরায় অনুশীলন করো।

সেট ১ 'শহীদ তিতুমীর' বিষয়ে রচনা লেখো। ১২	সেট ৭ প্রদত্ত সংকেতের আলোকে নিচের রচনাটি লেখো: ১২
সেট ২ 'বাংলাদেশের জাতীয় পানি: দোয়েল' বিষয়ে রচনা লেখো। ১২	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস: [সূচনা; ঐতিহাসিক পটভূমি; শহিদ মিনার; আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস; একুশে ফেব্রুয়ারি ও বাংলা ভাষার ব্যবহার; উপসংহার]
সেট ৩ 'সুন্দরবন' বিষয়ে রচনা লেখো। ১২	সেট ৮ প্রদত্ত সংকেতের আলোকে নিচের রচনাটি লেখো: ১২
সেট ৪ 'নীতের সকাল' বিষয়ে রচনা লেখো। ১২	বাংলাদেশের জাতীয় ফল [সূচনা; কাঁঠালের আকার-আকৃতি; প্রাপ্তিস্থান ও সময়; পুষ্টিগুণ; অর্থনৈতিক গুরুত্ব; উপসংহার]
সেট ৫ 'বাংলাদেশের ঝড়বৈচিত্র্য' বিষয়ে রচনা লেখো। ১২	সেট ৯ প্রদত্ত সংকেতের আলোকে নিচের রচনাটি লেখো: ১২
সেট ৬ প্রদত্ত সংকেতের আলোকে নিচের রচনাটি লেখো: ১২	বিদায় হজ [ভূমিকা, বিদায় হজ, ভাষণের বিষয়বস্তু, বিদায় হজের গুরুত্ব, উপসংহার]
বাংলাদেশের কুটির শিল্প [ভূমিকা; কুটির শিল্প; কুটির শিল্পের ধরন ও নাম; কুটির শিল্পের অতীত অবস্থা; কুটির শিল্পের প্রয়োজনীয়তা; কুটির শিল্প; পুনরুদ্ধারের উপায় ও উদ্যোগ; উপসংহার]	সেট ১০ প্রদত্ত সংকেতের আলোকে নিচের রচনাটি লেখো: ১২
	বাংলাদেশের উৎসব [ভূমিকা; মুসলিমদের উৎসব; হিন্দুদের উৎসব; বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানদের উৎসব; ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের উৎসব; উপসংহার]

উত্তরমালা: নিজেকে যাচাই করি

সেট ১ পৃষ্ঠা ১১২, প্রশ্ন নং ২।	সেট ২ পৃষ্ঠা ১১৬, প্রশ্ন নং ১৬।	সেট ৩ পৃষ্ঠা ১১৯, প্রশ্ন নং ২৫।	সেট ৪ পৃষ্ঠা ১২১, প্রশ্ন নং ৩২।
সেট ৫ পৃষ্ঠা ১২০, প্রশ্ন নং ২৭।	সেট ৬ পৃষ্ঠা ১১৩, প্রশ্ন নং ৪।	সেট ৭ পৃষ্ঠা ১১৫, প্রশ্ন নং ১১।	সেট ৮ পৃষ্ঠা ১১৭, প্রশ্ন নং ১৯।
সেট ৯ পৃষ্ঠা ১১৪, প্রশ্ন নং ৯।	সেট ১০ পৃষ্ঠা ১১৯, প্রশ্ন নং ৫৯।		